নব মানবতাবাদ

NEW HUMANISM

(A MANIFESTO)

মানবেন্দ্রনাথ রায়

অনুবাদক

স্বদেশরঞ্জন দাস

জিজ্ঞাসা

কলিকাতা : ৯ ॥ কলিকাতা : ২৯

NABA MANABATABAD

By Swadesranjan Das

[A Bengali version of M. N. Roy's NEW HUMANISM]

দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৬৩

[অনুবাদক স্বদেশরঞ্জন দাস মহাশয়ের নির্দেশিত ব্যবস্থায় তাঁর লেখা নতুন ভূমিকা সম্বলিত গ্রন্থ]

প্রকাশক

শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

জিজ্ঞাসা

১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা : ৯

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা : ২৯

মুদ্রক

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ব্রাহ্মমিশন প্রেস

২১১/১, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

মুদ্রক

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

সুশীল প্রিণ্টার্স

২, ঈশ্বর মিল বাই লেন

কলিকাতা-৬

নব মানবতাবাদ

অনুবাদকের নিবেদন

নিউ হিউম্যানিজ্‌ম্‌ দর্শনের উদ্গাতা মানবেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৮৭ ষ্টাব্দের ২১শে মার্চ। পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর বয়স খন চৌদ্দ, অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দ থেকেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা ংগ্রামে যোগ দেন। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সততা, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা বলে তনি শীঘ্রই বৈপ্লবিক সংগঠনের একজন বিশিষ্ট কর্মী হয়ে ওঠেন এবং নেতা যতীন মুখার্জীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হন। দক্ষতার সঙ্গে ঃসাহসিক কাজকর্ম সম্পাদনে ও সংগঠনশক্তিতে তিনি এমনই মসাধারণ কুশলতার পরিচয় দেন যে সিডিসন কমিটির চোখে তিনি াংলার অগ্নিযুগের সর্বাপেক্ষা রোমান্টিক চরিত্র রূপে প্রতিভাত হন।

অস্ত্রের সন্ধানে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, চীন, জাপান হয়ে মামেরিকায় পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম গ্রহণ রেন। মার্ক্‌স্‌বাদী ও সোস্যালিস্টদের সঙ্গে পরিচিত হন। মার্কিন ুলিশের হাতে ধরা পড়েন; কিন্তু মেক্সিকোয় পলায়ন করতে সক্ষম ন। সেখানে সোস্যালিস্ট আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনা করেন াবং রুশিয়ার বাইরে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন ক'রে তার প্রধান ম্পাদক হন। লেনিনের নিমন্ত্রণে রুশিয়ায় যান এবং পরাধীন াতিসমূহের স্বাধীনতা সংগ্রামের নীতিপদ্ধতি ও কমিউনিস্ট পার্টির র্তব্য সম্বন্ধে লেনিনের মতকে খণ্ডন করেন এবং এক বিকল্প প্রস্তাব চনা করেন। কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশন্যালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লনিনের সমর্থনে তা গৃহীত হয় এবং চীন ভারত সহ ঔপনিবেশিক দশসমূহের বিপ্লব পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন এবং সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের নতৃত্বে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশন্যাল যখন উগ্র বামপন্থী নীতি গ্রহণ রে তখন মানবেন্দ্রনাথের নীতিও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ কংগ্রেসে

পরিত্যক্ত হয়। সেই সঙ্গে তাঁর ইনটারন্যাশন্যালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তিনি তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ দেবার জন্য ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে গোপনে ভারতে আসেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় অনুপস্থিত আসামীর গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বলে ধরা পড়েন এবং বারো বছরের কারাদণ্ড আপীলে কমে ছয় বছর হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর মুক্ত হয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন, কিন্তু গান্ধীবাদ ও যুদ্ধনীতি সম্পর্কে মতবিরোধের ফলে কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি ঘোষণা করেন, ফ্যাসিবিরোধী শক্তিগুলি জিতলে, যদিও এই ফ্যাসিবিরোধী শক্তিগোষ্ঠীর অধিকাংশ অংশীদারই সাম্রাজ্যবাদী দেশ, তথাপি, পৃথিবী থেকে সাম্রাজ্যবাদ লোপ পাবে এবং অন্যান্য পরাধীন দেশের সঙ্গে ভারতও স্বাধীনতা পাবে। অতএব ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধপ্রচেষ্টাব সঙ্গে যোগ দেওয়ার অর্থই হবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চালানো। পক্ষান্তরে ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি জিতলে পৃথিবী থেকে স্বাধীনতা বহুকালের জন্য লোপ পাবে।

যুদ্ধে ব্রিটিশ প্রমুখ ফ্যাসিবিরোধী শক্তিগুলি জিতলে কেবল ভারতই স্বাধীনতা পেল না, অন্যান্য সকল পরাধীন জাতিও একে একে স্বাধীনতা পেতে থাকল। মানবেন্দ্রনাথের শুধু এই যুদ্ধনীতি মাত্রই সাফল্যমণ্ডিত হল না, সেই সঙ্গে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর উপনিবেশের বিপ্লবের নীতিতে যে কথাটি বলেছিলেন, এবং লেনিন ছাড়া যখন সেই decolonisation থিসিসের তাৎপর্য পৃথিবীর আর কেউ বোঝে নি, সেটিও সাফল্যমণ্ডিত হ'ল। মানবেন্দ্রনাথের তখনকার কথা যে কত সত্য ছিল তা মহাকাল জানিয়ে দিল। তাঁর ডিকলোনি[illegible]শন থিসিসের সব কথা বর্ণে বর্ণে ফলে গেল। সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা পর পর দুটি মহাযুদ্ধের ফলে অর্থবল হারিয়ে ধীরে ধীরে দেশীয় ধনীদের হাতে প্রথমে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও পরে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বেচ্ছায়

ছড়ে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথের মতানুসারে কৃষক-শ্রমিক মধ্যবিত্তদের সংগঠিত ক'রে জাতীয় কংগ্রেসে বিকল্প নেতৃত্ব স্থাপন না করার ফলে ভারতে ও অন্যান্য পরাধীন দেশে জনগণের সরকার স্থাপিত না হয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ল ধনিক-বণিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাতীয় সরকার। কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে না থেকে লেজুড় হয়েই পিছু পিছু চলতে থাকল, আর কিছুদিন অন্তর অন্তর অতীতের ভুলকে স্বীকার ক'রে পুনরায় নতুন ক'রে ভুল পথ অনুসরণ করতে থাকল।

মানবেন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে স্ট্যালিনী রুশিয়া যেমন পশ্চিম ইউরোপের সোস্যালিস্ট ও প্রগতিশীল শক্তির সাহায্যে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ জিতেছে, তেমনই সেই শক্তির সাহায্যে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে এক উচ্চতর আসল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হবে। কিন্তু রুশিয়া তা না ক'রে তার নিজ অধীনে উলঙ্গ ডিক্টেটরি শাসনাধীন সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় মন দিল। ফলে পশ্চিমী শক্তিসমূহ ভীত হয়ে পুনরায় যুদ্ধসজ্জা শুরু করল এবং পৃথিবী তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলতে থাকল। পৃথিবী জুড়ে সভ্যতার মহাসংকট আরো ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। তখন মানবেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনব্যাপী জ্ঞান-অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সংকটের কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন এবং সংকটত্রাণের উপায়পদ্ধতির সন্ধান দিলেন। নব মানবতাবাদ মানবসভ্যতার এই সংকটত্রাণেরই দর্শন। এই কথা তিনি তাঁর উদ্ভাবিত দর্শনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"পৃথিবী ব্যাপী আজ যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, জনগণের দারিদ্র্য, একাধিপত্য শাসনের আশঙ্কা, সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান আতঙ্ক প্রভৃতি বড় বড় আপদ ও অন্যান্য আরো কত দুর্গ্রহ পৃথিবীর সকল মানুষকে আজ সতত বিষাদমগ্ন ও আতঙ্কিত ক'রে রেখেছে, তার একটি মাত্র কারণেরই সন্ধান পাওয়া গেছে। তা হ'ল মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা।

এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যে সব বিভিন্ন প্রকারের সমাজদর্শন রচনা করা হয়েছে তার ফলে মানুষ যে নিজ চেষ্টায় নিজের ভাগ গড়ে তুলতে পারে সে বিশ্বাস সে আজ হারিয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষ তার ভাগ্য ও ইতিহাস গড়ে এসেছে, তা জেনেই হ'ক আর না জেনেই হ'ক, এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার না করলে যে পাশাপাশি বাস করা যায় না এইরূপ নৈতিক জ্ঞান লাভের যোগ্যতা ও ক্ষমতা যে তার আছে, এ বিশ্বাস তার ছিল, কিন্তু আজ তা সে হারিয়েছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বলা চলে যে, আধুনিক সভ্যতার এই সংকট বুদ্ধিবৃত্তির সংকট।...... পৃথিবীর এই ধ্বংসোন্মুখ বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে ত্রাণ পাবার উপায় অনুসন্ধানের জন্য ব্যগ্র হয়ে যে সব চেষ্টা করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, বর্তমান পৃথিবীর সকল অমঙ্গলের মূল হ'ল, মানুষ আজ তার আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে। সেই জন্যই সমগ্র মানবজাতি যখন পারমাণবিক মহাযুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হবার দিকে এগিয়ে চলেছে তখনো সে থামতে পারছে না, যেন এক নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে।"

ব্যক্তির মনে এই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনে সভ্যতার এই সংকটত্রাণের তত্ত্ব ও উপায়পদ্ধতির দর্শনবিজ্ঞানই নব মানবতাবাদের বিষয়বস্তু।

নব মানবতাবাদের মূল সূত্রের প্রথমেই তিনি মানুষের প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যটিকে তুলে ধরেছেন। তারপর সেই প্রকৃতি অনুসারে মানুষের স্বভাবের উপযুক্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত টেনেছেন এবং শেষ সূত্রটিতে বলেছেন যে:

"এই নব মানবতাবাদের মূল প্রত্যয় হ'ল প্রোটাগোরাসের ভাষায় 'ব্যক্তি-মানুষই সব কিছুর মানদণ্ড' কিংবা মার্ক্সের ভাষায় "ব্যক্তি-মানুষই মানবজাতির মূল' এবং এই দর্শন দিয়েছে এক মুক্তমন

নীতিনিষ্ঠ মানুষের সমবায়ে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের আদর্শ।"

মানুষের জন্মগত প্রকৃতি ও স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, সে মুক্তিপিয়াসী, যুক্তিপরায়ণ সুতরাং সত্যসন্ধানী জীব। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সত্যানুসন্ধিৎসাই মানুষের সকল অগ্রগতির মূল প্রেরণা।

মুক্তির অর্থ হ'ল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সকল বৃত্তি ও শক্তি বিকশিত ক'রে তোলার পথে যে সব বাধা আছে সে সবের ক্রমাবলুপ্তি। ব্যক্তির এই বিকশিত ব্যক্তিত্ব কিন্তু একান্তভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনকে আশ্রয় ক'রেই ফুটে উঠবে। ব্যক্তিকে সমাজচক্রের ব্যক্তিত্বহীন অবিচ্ছেদ্য দিক্ হিসাবে দেখলে চলবে না, তাতে ব্যক্তির বিকাশ ঘটবে না। যে কোন যৌথ ও সামাজিক সংগঠনের ভাল-মন্দ উন্নতি-অবনতির মানদণ্ড ব্যক্তি-মানুষ। সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সাফল্য-অসাফল্যের বিচারে দেখতে হবে, ব্যষ্টি এর কতটুকু পেল বা পেল না, এবং তার উপরেই নির্ভর করবে এই বিচারের রায়। (এক থেকে তিন সূত্র)

মুক্তিপথের যে সব বাধা আছে তা তিন ভাগে ভাগ করা যায়; প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক।

প্রথম বাধা যে প্রকৃতির বাধা তা অতিক্রম করতে হয় প্রাকৃতিক শক্তির ওপর প্রভুত্ব করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে সে বাধা অতিক্রম করতে আমরা শিখি। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষার প্রয়োজন হয় মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে করায়ত্ত ক'রে এই প্রাকৃতিক বাধাকে অতিক্রম করতে হয়।

কিন্তু জন-বিবোধী সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের পক্ষে সে বিদ্যা প্রয়োগ ক'রে অন্নবস্ত্র সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমতঃ সমাজের সকল মানুষ সকল প্রকার জ্ঞানবিদ্যালাভের সুযোগসুবিধা পায় না। দ্বিতীয়তঃ যারা কিছু পায় তারা সকলে উৎপাদনের উপায়সমূহের অভাবে (জমি, কলকারখানা প্রভৃতি) তা প্রয়োগ করতে পারে না। প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রমের বিদ্যা আয়ত্ত হলেও সমাজের বাধার জন্য তা সফল হয়ে ওঠে না।

দ্বিতীয় বাধা যে সমাজের বাধা তা দূর ক'রে সমাজকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক ক'রে তুলতে হয়। সেই জন্য প্রথমতঃ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিবেশীর এক হৃদ্য, সুখকর, পরস্পর উন্নতির সহায়ক, পরিপোষক ও সহযোগিতার সম্পর্ক গ'ড়ে তুলতে হয়। ব্যক্তির উন্নতির ও বিকাশের পরিপন্থী হ'ল পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, সংঘাত-সংঘর্ষ। এ সবই মানুষের কাম-ক্রোধাদি ভাবাবেগ থেকে জন্ম লাভ করে। যুক্তিবাদের দ্বারা কাম-ক্রোধাদি রিপুকে বশীভূত রাখতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্মিলিত ও সংহত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত রেখে নিজ নিজ আর্থিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করতে হয়।

জনসাধারণ যখন গ্রামে গ্রামে ও সহরের পাড়ায় পাড়ায় সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের নির্ধারিত প্রতিনিধিকে নির্দেশ দিয়ে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগ ও শাসন পরিচালন বিভাগকে (মন্ত্রিসভা) প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত করতে পারবে তখনই সমাজে এক শোষণহীন অর্থনীতি গ'ড়ে তুলে সকল ব্যক্তির আর্থিক অভাব-অনটন দূর করা সম্ভব হবে।

বর্তমান অর্থনীতি ব্যক্তি-মানুষের শোষণনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই শোষণ সম্ভব হয় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকগণের (ধনী বা রাষ্ট্র) দ্বারা নির্দিষ্ট মজুরী বা মাস মাহিনার বিনিময়ে শ্রমশীল নরনারীর শ্রমশক্তি কিনে মজুরী অপেক্ষা বেশী মূল্যের (surplus value) পণ্য উৎপাদন করিয়ে নিয়ে (social production and individual approprzation)। শোষণমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে তখনই যখন উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে মালিক-মজুর সম্বন্ধ লোপ পাবে (appropriation should be socialized to the same extent to which production is socialized)।

এই মালিক-মজুর সম্বন্ধ লোপ পেতে পারে তখনই যখন

উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর (কলকারখানা জমি প্রভৃতি) অধিকার উৎপাদনকারী শ্রমশীল মানুষের থাকবে। তা সম্ভব হতে পারে উৎপাদনের উপায়সমূহকে উৎপাদকের মালিকানার অধিকারে নিয়ে এসে ; অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্যের মালিকানা শ্রমিকদের হাতে ও ক্ষেতখামারের মালিকানা কৃষকের হাতে থাকবে। তখনই শোষণহীন অর্থনীতি গ'ড়ে উঠব।

তৃতীয় বাধা, মানুষের অন্তরের বাধা, নিজ চরিত্রগত বাধা, নিজ স্বভাবের বাধা। প্রকৃতির বাধা দূর করতে জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন ও বিকাশের জন্য যেমন চাই ধীশক্তির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন, তেমনি সামাজিক বাধা দূর করতেও চাই নানা বিষয়ে জ্ঞানবিদ্যা ও তদুপরি অপর মানুষের প্রতি প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা। কিন্তু এর কোনটিই সম্ভব হয় না যদি মানুষ নিজ নিজ মনকে জয় করতে না পারে, মনকে একাগ্র করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি ভাবাবেগকে যুক্তিবাদের সাহায্যে বশীভূত করতে না পারে।

এইসব বাধা অতিক্রমের উপায় (methodology) হ'ল শিক্ষা দান। বয়স্কদের শিক্ষা দিতে হবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, হাতেকলমে, দায়দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে। সেইজন্য গ্রামে গ্রামে, সহরের পাড়ায় পাড়ায় সকল পূর্ণবয়স্কদের সংঘবদ্ধ ক'রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা দিতে হবে। এই সব স্থানীয় গণপঞ্চায়েতগুলিই হবে তখন লোকশিক্ষার বিদ্যাপীঠ। দায়দায়িত্ব ঘাড়ে চাপার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে পূর্বাপর চিন্তা করতে বাধ্য করাবে এবং চিন্তাশীল মানুষই নীতিপরায়ণ মানুষ হবে। তখনই নিজেরাই বুঝবে যে তারা সব পারে, তখনই আত্মবিশ্বাস জাগবে। ব্যক্তিগত সমস্যা দূর করার তিন বাধা অপসারণের চেষ্টার শুরু থেকে জাতীয় সংকট তথা বিশ্বসংকট দূর করার চেষ্টাও চলবে।

বালকবালিকার শিক্ষার জন্য শিক্ষায়তনগুলির পাঠ্যতালিকা

ও শিক্ষাদান প্রণালী এমন ভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে সকল ছাত্রছাত্রীর শক্তি ও বৃত্তিসমূহ সুসামঞ্জস্যের সঙ্গে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান ও দায়দায়িত্ববহনের জন্য সঠিক চিন্তা করার পদ্ধতি শেখে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই নয়, সমস্ত ছাত্রছাত্রী যাতে জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে সূক্ষ্ম মানসিকতা, সৌন্দর্যরসে রসিকতা অর্জন করতে পারে এবং শারীরিক সুপুষ্টি, পরিণতি ও বলিষ্ঠতা লাভ করে ও সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হতে সক্ষম হয়, সে বিষয়ে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণকে তীক্ষ্ণ ও একাগ্র দৃষ্টি দিতে হবে।

মানবতাবাদ বাইশটি মূলস্সূত্রে গ্রথিত। প্রথম সূত্র থেকে ষষ্ঠ সূত্র পর্যন্ত মানবতাবাদের দার্শনিক তত্ত্ব রচিত হয়েছে। তারপর সেই দর্শনের মানদণ্ডে প্রচলিত লিবারেল মতবাদ ও মার্কসবাদের দার্শনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তত্ত্বের বিচার ও খণ্ডন ও নব মানবতাবাদী দর্শনের ভিত্তিতে নতুন এক সমাজের রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

নব মানবতাবাদের যুক্তিযুক্ততার বিচার পাঠকগণ করবেন, সত্য-মিথ্যার রায় মহাকাল দেবেন।

নব মানবতাবাদ সম্বন্ধে আগ্রহ ভারত অপেক্ষা ইউরোপ আমেরিকায় বেশী। যুগোস্লাভিয়া ও পূর্ব ইউরোপের রুশীয় কমিউমিজ্‌ম্-প্রভাবিত দেশসমূহে এ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ যখন প্রবল হয়ে উঠছিল, পরে যা হিউম্যানিস্টিক কমিউনিজ্‌মের রূপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে তখন ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী মানবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

স্বদেশরঞ্জন দাস

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য : 'নবমানবতাবাদ' পূর্বেই মুদ্রিত অবস্থায় ছিল, অনুবাদক স্বয়ং এর গ্রন্থনা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত করেন এবং আমাদের উপর গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব অর্পণ করেন। অনুবাদকের আকস্মিক মৃত্যুর পর আমরা তাঁর নির্দিষ্ট রীতিতেই গ্রন্থখানি প্রকাশ করলাম।—

প্রকাশক

ভূমিকা : প্রথম সংস্করণ

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বোম্বাই সম্মেলনে নব মানবতাবাদের মূলনীতি-গুলি একত্র ক'রে একটি ঘোষণাপত্র (ম্যানিফেস্টো) রূপে সেগুলিকে প্রচার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ছয় বৎসর পূর্বে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই মূলনীতিগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছিল। এই মূলনীতিগুলিই মূলসূত্র (Thesis) রূপে ঐ সম্মেলনে গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী ঘোষণাপত্রের খসড়াটি পার্টির কেন্দ্রীয় পলিটিক্যাল কাউন্সিলে আলোচনার জন্য পেশ করা হয় এবং তা ১৯৪৭ সালের ২৩শে থেকে ২৫শে মে পর্যন্ত আলোচিত হয়। পার্টির সম্মেলনে গৃহীত মূলসূত্রগুলির ও তার পূর্বে প্রচারিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতিটিকেই ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এই খসড়াটিতে। সেন্ট্রাল পলিটিক্যাল কাউন্সিল নীতিগত-ভাবে খসড়াটি অনুমোদন করে। কিন্তু সেই খসড়ার রচয়িতা হিসাবে আমি প্রস্তাব করি পার্টির দ্বারা আনুষ্ঠানিক ভাবে এটি গ্রহণ ও প্রচার সাময়িকভাবে মুলতুবী থাক। প্রস্তাবটি এই সর্তে গৃহীত হয় যে, ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষ যাতে খসড়াটি বিচার করার সুযোগ পায় সেই উদ্দেশ্যে তা প্রচার করা হবে। এটি শুধু আমার ব্যক্তিগত মতের বিবৃতি মাত্র নয়। আমি যে মূল খসড়াটি রচনা করি, অপর কয়েকজনের মূল্যবান সুপারিশ অনুসারে তার অনেকটা পরিমার্জনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, ফিলিপ স্প্র্যাট, সিকন্দর চৌধুরি, ও ভি. এম. তারকুণ্ডে।

এই পুস্তকে যে দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং জাগতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মত ব্যক্ত করা হয়েছে তা একদল বিচারশীল মার্ক্‌স্‌বাদী ও ভূতপূর্ব কমিউনিস্টদের ভাবনা ও চিন্তার ফলে বহু বছর ধরে তা বিকাশ লাভ করেছে। তাঁরা একদিকে জাতীয়তাবাদী ও অন্যদিকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিচ্ছেদ যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

সম্বন্ধে মতপার্থক্যের আশু কারণ নিয়েই ঘটেছিল, তথাপি পার্থক্যটা ছিল মূলগত। সেই মূল কাবণগুলো ছিল রাজনীতির সঙ্গে দার্শনিক ও নৈতিক প্রশ্নের সম্পর্ক বিষয়ক। এই মূল নীতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যুদ্ধের আশু সমস্যা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণে কমিউনিস্টরা, বিশেষ ক'রে ভারতে, বিশ্বজনীনতার আদর্শের দিকটা পরিত্যাগ ক'রে জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করায় তাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য লোপ পেয়েছিল।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের র‍্যাডিক্যালদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। পরে যখন পুনরায় যোগসূত্র স্থাপিত হয় তখন দেখা যায় যে অন্যান্য দেশের সামাজিক ও দার্শনিক মতবাদের মধ্যেও এক নতুন ভাব ও ভাবনার উদ্ভব ঘটেছে। এই ঘটনাকে, নব যুগের এই নতুন চিন্তাধারাকে আমরা স্বাগত জানালাম। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা অনুভব করলাম যে, শুধুমাত্র রাজনীতি ও অর্থনীতির পুনর্গঠন বিষয়ে চিন্তা করলেই এ যুগের প্রয়োজন মিটবে না। সারা দুনিয়া আজ সভ্যতার সংকটের আবর্তে তলিয়ে যেতে বসেছে। এই সংকটত্রাণের জন্য প্রয়োজন সমগ্র জীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, এক নতুন ভাব ও ভাবনা—এক নতুন দর্শন।

এ যুগের সংকটত্রাণের জন্য প্রয়োজন মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ এক বিরাট প্রচেষ্টা। এই পুস্তকটি সে প্রচেষ্টারই এক ক্ষুদ্র অংশ। এই ঘোষণার মূল বিষয় হচ্ছে বর্তমানের এই সর্বগ্রাসী সংকটমুক্তির সমাধান স্বরূপ আমূল গণতন্ত্রের বাইশটি সূত্র। এর উপাদানসমূহ সংগৃহীত হয়েছে আমার পূর্বেকার দুটি পুস্তক—"নিউ ওরিয়েণ্টেশন" ও "বিয়ণ্ড কমিউনিজ্‌ম্‌" থেকে ও সেই সঙ্গে এর পশ্চাৎ পটভূমিকার সন্ধানও এই দুটি পুস্তক থেকেই পাওয়া যাবে।

দেরাদুন
১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭

মানবেন্দ্রনাথ রায়

ভূমিকা : দ্বিতীয় সংস্করণ

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগস্টে এই ঘোষণাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চতুর্থ নিখিল ভারত সম্মেলনে পার্টিকে রূপান্তরিত ক'রে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট মুভমেণ্টে পরিবর্তিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পার্টি সম্মেলনে গৃহীত ও পরে এই ঘোষণায় পরিবর্ধিত আমূল গণতন্ত্রের মূলসূত্রের যে চিন্তাধারা প্রকাশ করা হয় তারই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি ঘটে এই সিদ্ধান্তে। সেই মূল সূত্রগুলি ও চতুর্থ সম্মেলনের প্রস্তাবটি ঐতিহাসিক উপাদান স্বরূপ এই পুস্তকের পরিশিষ্টে দেওয়া হ'ল। মূলসূত্রের ১৯ ও ২০ সংখ্যার সূত্র ও ঘোষণাপত্রের শেষ তিনটি পরিচ্ছেদ পার্টির অবলুপ্তির প্রস্তাব অনুযায়ী সংশোধন করা হল।*

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে কলিকাতায় র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট মুভমেণ্টের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার উদ্দেশ্য ছিল, নব মানবতাবাদ দর্শন থেকে উদ্ভূত রাজনীতি ও অর্থনীতির আচরণ ও প্রয়োগ সম্পর্কে দুটি বিবৃতি প্রকাশ করা। এ দুটি বিবৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য আমি যে প্রারম্ভিক ভাষণ দিই তাও পরিশিষ্টে সংযোজিত হ'ল। মানুষের সমগ্র ইতিহাস যে যুক্তিপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ মানুষেরই রচনা, এই সত্যের উপর ভিত্তি করেই এক সমাজ-দর্শনের রূপরেখা আঁকা হয়েছিল সে ভাষণে; এবং এ কথাও বলা হয়েছিল যে, সেই রূপরেখাকে বাস্তবে ফুটিয়ে তুলতে হলে ইতিহাসের সেই সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তা করতে হবে। আমার ("Reason, Romanticism & Revolution") 'রিজন, রোম্যাণ্টিসিজম অ্যাণ্ড রেভলিউশন' নামক পুস্তকে সভ্যতার প্রথম

*এর পূর্বরূপ মূল ইংরেজী সংস্করণের পাদটীকায় দেওয়া আছে।

থেকে ইতিহাসের অনুরূপ মানবতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি। এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয় খণ্ডটিও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। (দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়।—অনুবাদক)।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, পরিশিষ্টে গ্রথিত ইতিহাসের ও সমাজের মানবতন্ত্রী দর্শনের যে মূলসূত্র দেওয়া হয়েছে তা প্রকৃতি ও জীবনের সামগ্রিক দর্শন থেকেই উদ্ভূত, যদিও একে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করার কাজ এখনো বাকী। বিশ্বতত্ত্ব (cosmology) ও সৃষ্টিতত্ত্ব (ontology), জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) ও নীতিতত্ত্ব (ethics)-এর সিদ্ধান্তসমূহের যে সব সত্য এই সকল মূলসূত্রে দেওয়া আছে তারই সাহায্যে সে ব্যাখ্যা করতে হবে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁস ইন্‌স্টিটিউটের উচ্চ শিক্ষার গ্রীষ্মকালীন শিবিরে নব-মানবতাবাদের দার্শনিক ভিত্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সেই উপলক্ষে আমার উদ্বোধনী ভাষণটিও পরিশিষ্টে দেওয়া হ'ল।

নব মানবতাবাদকে যদিও এখানে একটি রাজনৈতিক দর্শন রূপে উপস্থাপিত করা হ'ল তথাপি এটি একটি পরিপূর্ণ দর্শন। ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তির উপরেই এই দর্শনের অবস্থিতি। সেই জন্য এটি একটি বাঁধাধরা সনাতনী ভাবনাগুচ্ছ নয়; সেই জন্য এটি কোন গোঁড়া, নির্বিচারী দর্শনও হবে না; কিংবা নির্ভুলতা ও চূড়ান্ততার দাবীও করে না। এ দর্শন মানুষের অস্তিত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। এই প্রচেষ্টার ফলে, কেমন ক'রে মানুষ তার স্বভাবগুণে যুক্তিপরায়ণ তথা নীতিপরায়ণ হয়ে এক মুক্ত, ভারসাম্যে সুসমঞ্জস এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে তা এই দর্শনে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

দেরাদুন
এপ্রিল, ১৯৫৩

মানবেন্দ্রনাথ রায়

সূচীপত্র

১।	কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ঘোষণার পরবর্তী যুগ	...	১
২।	প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদসমূহের অসম্পূর্ণতা	...	৫
৩।	কমিউনিস্ট তত্ত্ব ও প্রয়োগব্যবস্থার অধোগতি	...	১৩
৪।	মার্ক্সবাদের গোত্র লিবারেল মতবাদ	...	২৬
৫।	মার্ক্সবাদী বিপ্লবের তত্ত্ব	...	৩৩
৬।	একটি নতুন রাজনৈতিক দর্শন	...	৪৭
৭।	র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাসি (আমূল গণতন্ত্র বা মানবতন্ত্র)	...	৫৪

পরিশিষ্ট

ক।	আমূল গণতন্ত্রের মূলসূত্র	...	৭৫
খ।	নব-মানবতাবাদ রূপায়ণের কর্মসূচী	...	১০৩
গ।	বিজ্ঞান ও সমাজ	...	১১৭
ঘ।	নতুন সমাজদর্শনের ভিত্তি	...	১৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ

কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো ঘোষণার পরবর্তী যুগ

সর্বহারা বিপ্লবের যুগকে স্বাগত জানাতে যে কমিউনিষ্ট ঘোষণা-পত্রখানি প্রকাশিত হয়েছিল তারপর একশ বছর কেটে গেল (১৮৪৮-১৯৪৭)। উদীয়মান বুর্জোয়া ধনীদের সন্ত্রস্ত করতে কমিউনিষ্ট দানব যে সারা ইউরোপে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, একথা তখন লেখা হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে সে দিন সে কথা সত্য না হলেও এবং খানিকটা শ্লেষাত্মক মনে হলেও, আজ কিন্তু তা একরকম সত্য হয়ে উঠেছে। ধনতন্ত্রের অত্যাচারের হাত থেকে সারা দুনিয়াকে বাঁচাবার জন্যে ত্রাণকর্তারূপে যে কমিউনিজমকে আহ্বান জানান হয়েছিল সেই কমিউনিজম আজ কেবল যে ধনীদের পক্ষেই ভয়ঙ্কর দানবরূপে দেখা দিয়েছে তাই নয়, সারা দুনিয়ার সভ্য, ভদ্র ও প্রগতিশীল মানুষ—যাঁরা বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কামনা করেন কিন্তু সমগ্র মানব সভ্যতার অতি মূল্যবান ঐতিহ্য স্বরূপ সমাজের শিক্ষা সংস্কৃতিকে সমাজ বিপ্লবের ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে, নির্মমতার সঙ্গে না হলেও, অবহেলার সঙ্গে বিসর্জন দিতে রাজি নয়, তাদের মনেও মহাত্রাসের সঞ্চার করেছে।

এটা ইতিহাসের ব্যঙ্গ না অদৃষ্টের পরিহাস? সেটা যাই হোক্,

আসলে একশ বছর আগে মহা আড়ম্বরে এক অবতারসুলভ উদাও কণ্ঠে যে সর্বহারা-বিপ্লব যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করা হয়েছিল, তার আবির্ভাব আজও ঘটেনি। সেই প্রত্যাশিত বিপ্লব মোটামুটি ঈপ্সিত ধাঁচেই ঘটল বটে কিন্তু তা পঁচাত্তর বছর পরে একটিমাত্র দেশে, এবং তাও ছড়িয়ে প'ড়ে বিশ্ব-বিপ্লব ঘটাতে পারল না।* রুশিয়ার বিপ্লবোত্তর ঘটনাবলীও খুব উৎসাহব্যঞ্জক হল না। কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টোতে বর্ণিত স্বপ্ন রাজ্য গড়ে তোলার দিকেও তা এগিয়ে চলল না। এমন কি এই রুশ বিপ্লবের বহুপূর্বেই সর্বহারা বিপ্লবের পরিকল্পনা তার আদিম নৈতিক আবেদন ও মানবিক রোমান্টিক আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল। এই সর্বহারা বিপ্লব যখন একটি মাত্র দেশেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, পৃথিবীর আর কোথাও ছড়িয়ে পড়ল না, তখনই বাস্তব প্রমাণের দ্বারা বোঝা গেল, এই নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা রুশিয়ার সাধারণ মানুষের, মুক্তিপিয়াসী প্রমিথিউসের মত, বন্ধন মুক্তির উদগ্র আগ্রহে রচিত হয়নি; সেইজন্য এই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা বৌদ্ধিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষের সৃজনী শক্তির বন্ধন-দশা ঘুচল না। পরিবর্তে যে সকল সর্বহারা ব্যক্তি মিলে সর্বহারা শ্রেণী গড়ে তুলেছে সেইসব ব্যক্তিদের নিকট থেকে সার্বিক আনুগত্য দাবী করে সর্বহারা শ্রেণীর কাল্পনিক সমষ্টি সত্তাকে দেবতা বানিয়ে তারই বেদীমূলে তাদের বলি দেবার ব্যবস্থা চলল।

এর ফলে ঘটেছে এক মহাভয়ঙ্কর অনর্থ। বহুবিলম্বে যখন সর্বহারা

*দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর যুগে পূর্ব-ইউরোপে ও চীনে কমিউনিষ্টদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল সর্বহারা বিপ্লবের ফলে ঘটেনি, ঘটেছে রুশিয়ার লাল ফৌজের প্রত্যক্ষ সাহায্যের ফলে। (অনুবাদক)।

বিপ্লবের যুগ শুরু হল তখন দেখা গেল, সে যুগ প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগ—প্রতিবিপ্লবের যুগ। একেই বলে ইতিহাসের পরিহাস।

কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো ঘোষণা করেছিল, সর্বহারা বিপ্লবের জয়লাভের পরই শুরু হবে সভ্যতার ইতিহাস। তার পূর্ব পর্যন্ত যা ঘটেছে তা সবই "প্রাগৈতিহাসিক"। তার কারণ মানুষ এ যাবৎ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে দাসত্বের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে এসেছে। সর্বহারা বিপ্লবের যুগ পরিণতি লাভ করবে বিশ্ব-বিপ্লবে, যার ফলে বন্ধনমুক্ত স্বাধীন মানুষের ইতিহাস রচনা শুরু হবে। যদিও এটা ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা, তথাপি এটা যে খুব প্রেরণাদায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথম সর্বহারা বিপ্লব যখন ঈপ্সিত বিশ্ব-বিপ্লবে পরিণত হলনা, তখন ধরতে হবে ইতিহাসেরও আরম্ভ হয়নি। এবং সেই জন্যই বোধ হয় জন্তু-জগতের নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে "প্রাগৈতিহাসিক যুগে" আবদ্ধ থেকে সভ্য জগৎ আজ সর্বধ্বংসী পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে সংঘটিত তৃতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ যে অন্য দুটি মহাযুদ্ধ অপেক্ষা আরো বহুগুণ ধ্বংসাত্মক হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ ঘটেছিল ধনতন্ত্রের অন্তর্বিরোধ ও বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে। এই মহাযুদ্ধ বহুবিলম্বিত সর্বহারা বিপ্লবকে সম্ভব করে তুলেছিল। তারপর কমিউনিজমকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আবির্ভাব ঘটল ফ্যাসিজমের। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক নিয়মের এন্টিথিসিসের নীতির সত্যতা নিঃশেষে প্রমাণ করবার জন্যই যেন ব্যাপারটা ঘটল। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে কমিউনিজম ও তার বিরোধীশক্তি ফ্যাসিজমের দ্বন্দ্বের ফলে দুই শক্তিরই বিলোপ ঘ'টে (negation of negation) এক উন্নততর' সভ্যতার উদ্ভব ঘটতে

পারত। কিন্তু তা ঘটল না ; যা ঘটছে তাতে পুনরায় আর একটি বিশ্ব-মহাযুদ্ধের দিকে পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মুমূর্ষু পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্যে যাদের ওপর ভরসা করা গিয়েছিল আজ তারাই সারা দুনিয়াকে মহাধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো যে সর্বহারা বিপ্লবের যুগকে আহ্বান জানিয়েছিল, এবং রুশ বিপ্লবেই সেই যুগের উদ্বোধন হয়েছে বলে যে ধারণা করা হ'ল, তা কোন শ্রেষ্ঠতর সভ্যতার বার্তা বহন করে আনেনি, আনল দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও এক সর্বধ্বংসী যুদ্ধের আশঙ্কা। শত বর্ষের প্রত্যাশা কি দিবা স্বপ্নের মতই মিথ্যা হয়ে যাবে ? জলের আলপনার মতই কি তা নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে ? কিংবা এর সবটাই এক দুঃস্বপ্ন ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদ-সমূহের অসম্পূর্ণতা

মানুষের প্রগতি ও কল্যাণ সম্বন্ধে আস্থাবান চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বর্তমান নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে গভীর অস্বস্তি বোধ করছেন। অবস্থা যতই খারাপ হোক তাই বলে নিয়তির ওপর নির্ভর করে বসে থাকাও চলে না। আজ এই যে এক মহাসংকটের আবর্তে পড়ে সভ্য জগৎ তলিয়ে যেতে বসেছে তা থেকে বাঁচবার জন্য এই সংকটের কারণ খুঁজে বের করতে প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই দ্রুত অথচ গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে, এবং তা দূর করার জন্য সাহসের সঙ্গে এগিয়েও যেতে হবে।

প্রথমেই যুক্তির সাহায্যে নির্ভুল পদ্ধতিতে চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করতে হবে। যুক্তি সম্মত চিন্তার অভাবে যে অন্ধ আবেগ ও গোঁড়ামি বর্তমানে উলঙ্গ উন্মত্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে সে সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দিতে হবে। অনেকে মনে করেন, আর একটা মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তারপর পুরাতন সমাজ ও রাষ্ট্রের ধ্বংস স্তূপের ওপর গড়ে উঠবে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র। কিন্তু ঐরূপ মনোভাব শুধু যে চরম চিন্তাহীনতার পরিচয় তাই নয়, এটা একটা অপরাধও বটে। এই মত হয়ত মার্কসীয় অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ-

সম্মত হতে পারে ; তাতে কিন্তু একদিকে যেমন মানুষের চিন্তা, ভাব ও ভাবনার গতিতত্ত্ব সম্বন্ধে দুঃখজনক অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, অন্যদিকে তেমনি প্রকাশ পায় এই অহেতুক নিষ্ঠুর বিশ্বাস যে, কমিউনিষ্ট বিপ্লব না ঘটা পর্যন্ত পৃথিবীর "প্রাগৈতিহাসিক" অবস্থাতে জন্তু জগতের নিয়ম অনুসারে মানুষ কামড়া কামড়ি করেই মরবে।

আর একটি যুদ্ধের ওপর যদি বিশ্ব-বিপ্লবের জয় নির্ভর করে তবে বিপ্লবের এই অন্ধ গোঁড়া ভক্তরা তাদের বিপ্লবকে ঠেলে নিয়ে চলেছে এমন এক যুদ্ধ জয়ের মধ্যে যে জয় হবে তা হবে পরাজয়ের চেয়েও শোচনীয়। আর একটি বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ফল যে অতি ভয়ানক হবে, এমন কি তাতে মানব সভ্যতা পর্যন্ত ধ্বংস হতে পারে, তা বুঝতে খুব বেশী কল্পনা শক্তির প্রয়োজন হয় না। সেই ভয়াবহ পরিণতি যেমন করেই হোক আমাদের রোধ করতে হবে। পুরাতন অন্তঃসার শূন্য রাজনৈতিক মতবাদ সমূহ ও কমিউনিষ্ট স্বর্গরাজ্য গড়ার তত্ত্ব, যা ইতিহাস অতি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বাতিল করে দিল, তা সব পরিত্যাগ করেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। এই যে, যেন নিয়তি নির্দেশিত হয়েই, পৃথিবী আজ আর এক মহাযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে তা নিবারণ করার ক্ষমতা তথাকথিত পশ্চিমী গণতন্ত্র বা রুশ কমিউনিজমের নেই। বর্তমান সংকট থেকে জগতকে উদ্ধার করার ক্ষমতা এদের কোন পক্ষেরই নেই। পশ্চিমী গণতন্ত্রের আছে সকল মুস্কিলের আসান স্বরূপ মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শূন্যগর্ভ আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান সমূহ, আর কমিউনিষ্টদের আছে এমন একটা আদর্শ যা রূপায়িত করতে গিয়ে এমন সব অভিজ্ঞতা হল, যার ফলে সে আদর্শের জলুস ত গেলই, যারা স্বৈরাচারী একাধিপত্যের অত্যাচার ও মানসিক দাসত্বের নিগড় থেকে

পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছিল তারাও আজ বিমুখ হয়ে গেল।

প্রগতিশীল জগতে যাঁরা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অর্থনতিক সৌম্যের আদর্শে বিশ্বাসী, যাঁরা মানব সভ্যতার ঐতিহ্য সমূহকে মূল্যবান জ্ঞান করেন, তাঁরা আজ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নেতৃত্বের জন্যে যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির গড়ে উঠেছে তার টানা-হেঁচড়ার মধ্যে পড়ে গেছেন। এই দুই বিবদমান পক্ষের পরস্পরের মধ্যে আচার-আচরণের ও মূল্যমানের কোন সর্বজনগ্রাহ্য মান দণ্ড না থাকায় এদের মধ্যে কোন সহযোগিতার কথা ওঠেই না। আজ তার ফল হয়েছে পরস্পরের মধ্যে এক যন্ত্রনাদায়ক সন্দেহ, অসহনীয় অবিশ্বাস, হাসতে হাসতে পরস্পরের পিঠে ছুরি মারার নির্মমতা, সমাজে ভারসাম্যের একান্ত অভাব ও যে কোন মুহূর্তে তা ভেঙ্গে পড়ার উৎকণ্ঠা। মানব সভ্যতার এই সর্বাপেক্ষা মহাসংকটে আজ প্রয়োজন এক নতুন প্রত্যাশা, এক নতুন প্রত্যয়, এক নতুন আদর্শ—এ যুগের উপযোগী এক নতুন রাজনৈতিক দর্শন ও তার প্রয়োগ কৌশল।

এক এক সময় মনে হয়, বিপর্যয়ের হাত থেকে পৃথিবীর বুঝি আর পরিত্রাণ নেই। গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের মত যেন নিয়তি তাড়িত হয়েই অনিবার্য গতিতে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের নাটকীয় দৃশ্যাবলী একের পর এক উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে। এই মহা আহবের এক দিকে আছে দৃঢ়বদ্ধ পার্টির একনায়কতন্ত্রের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী রুশিয়া ও তার তাঁবেদার কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র সমূহ। শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এরাই প্রয়োজন অনুসারে এক নায়কতন্ত্রকে পিপ্‌লস ডেমোক্র্যাসিও বলে থাকে। উপরন্তু যে সব দেশ গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আস্থাবান তাদেরও এরা বিশ্বাস করে না।

অন্যদিকে আছে সমগ্র ইউরোপে সত্যিকারের যারা প্রগতিশীল, ধনতন্ত্রের ওপর যারা আস্থা হারিয়েছে, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে এত দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করার পর আর কোন প্রকার একনায়াকত্বকেই যারা আর বরদাস্ত করতে রাজী নয়, এবং সেই জন্য তারা আজ এক নতুন জগত গড়ে তোলার কাজে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে উদ্‌গ্রীব। তা ছাড়া যে সব দেশ বহুদিন থেকেই গণতন্ত্র ভোগ করে আসছে সেই সব দেশের বহু সমাজতন্ত্রীও কোন প্রকার একাধিপত্যই মেনে নেবে না। এই পরস্পর বিরোধী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছেনা।

ইউরোপের গত সিকি শতাব্দীরও বেশী সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও কমিউনিষ্ট পার্টিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ, সীমাহীন বাদ-বিতণ্ডা ও অতি তিক্ত গালি-গালাজের দ্বারা ভারাক্রান্ত। সে দুঃখজনক ইতিহাসের স্মৃতি মুছে ফেলবার নয়। এদের মত পার্থক্যও সামান্য ছিল না। গণতন্ত্র ও এক-নায়কত্বের ধারণা পরস্পর বিরোধী। পরস্পর বিরোধী দর্শন এবং বিপরীত নৈতিক অনুশাসন ও সামাজিক আচার-আচরণ থেকেই এ দু'য়ের উদ্ভব।

মানবতাবাদী ঐতিহ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা (বা ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিষ্টরা) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সুসমঞ্জস সমবায় রূপে সমাজকে দেখে এসেছে। স্বাধীনসত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তি যে তার সামাজিক কর্তব্য পালন করে, তা কোন বাধ্যবাধকতার জন্য বা কোন শ্রেণী বিশেষের সমষ্টিসত্তার বেদীমূলে ভক্তি বা আত্মবলিদানের জন্য করে না, তা করে তার নৈতিক দায়িত্ব বোধ থেকে; আর এই

দায়িত্ববোধ জাগে মুক্তি পিপাসার চেতনাবোধ থেকে *। অপর দিকে এক-নায়কত্বের আদর্শ আধুনিক সভ্যতার ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। রেনেসাঁসের পর মানুষ যে সব সামাজিক ও নৈতিক মূল্যমানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একদিকে খ্রীষ্টীয় ধর্মের মানসিক দাসত্ব ও অন্যদিকে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিল. একনায়কত্বের আদর্শ সে সব ঐতিহ্য ও মূল্যমানকে অস্বীকার করে। এই দুই মতবাদের বিরোধ যখন এতখানি তীব্র, যে জন্য পৃথিবী আজ দুই বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে, তখন এদের মধ্যে কোন মীমাংসাই সম্ভব নয়। কিংবা এক পক্ষ অপর পক্ষের অধিকাংশকে টেনে নিয়ে দলভারী করে অপর পক্ষকে হারিয়ে দিতেও পারবে না। কারণ দুই মতবাদই ত্রুটিপূর্ণ, বর্তমান যুগের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে একান্তই অসম্পূর্ণ। বাস্তব অভিজ্ঞতায় উভয় মতবাদই সাধারণ ব্যক্তিমানুষের আস্থা হারিয়েছে।

মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের দোহাই দিলেও একনায়কত্বের তত্ত্ব ও তার

* মানুষ স্বভাবতঃ পিঁপড়ে মৌমাছির মত সমাজবদ্ধ জীব নয়—সে স্বভাবত পারিবারিক। সহজাত যুক্তিবুদ্ধির জন্য ব্যক্তি-মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল নিজের সুখ-সুবিধা বাড়াবার জন্যে। কিন্তু প্রতিবেশীর ওপর সদব্যবহার না করলে সমাজ টেকে না এই অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন পালন করার প্রয়োজন অনুভব করে। নীতিপরায়ণ সমাজেই একজন অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না, তার ফলে স্বীয় পছন্দমত জীবনযাপন সম্ভব হয়। নীতিপরায়ণ সমাজেই মানুষ মুক্ত জীবন যাপন করতে পারে।

(অনুবাদক)

প্রয়োগ ব্যবস্থা একেবারেই বিরক্তিকর। পক্ষান্তরে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলিকেও উপেক্ষা করা যায় না। এতে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে কেতাবী ধারণামাত্র করেও রাখা যায়। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র যে শ্রেণী বিশেষের একনায়কত্ব স্বরূপ, এই মার্কসীয় মত স্বীকার না করলেও, যদিও তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা কঠিন, তথাপি পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের ত্রুটি যে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত, তা আধুনিক ইতিহাসের মেধাবী ছাত্রের চোখে অবশ্যই ধরা পড়বে। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার অতিশয় জটিল সমাজে কোন নাগরিকের পক্ষে, বিশেষ করে গরীবের পক্ষে, গণতন্ত্রে যে সার্বভৌম রাজক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ খুব কমই মেলে। সংকট সময়ে আইনকানুন পর্যন্ত তাদের রক্ষা করতে অসমর্থ হয়। এটা সর্বজন স্বীকৃত তথ্য যে পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনা যন্ত্রের ওপর জনগণের কোন হাত থাকে না।

দুটি নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে সরকারী কাজকর্ম পরিচালন ব্যাপারে জনগণের মতামতের কোন প্রয়োজন হয় না, তাদের কোন মূল্য থাকে না। এই সময়ে পার্লামেণ্টে যে পার্টি সংখ্যাধিক্য লাভ করে সে পার্টি তার ইচ্ছামত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেই চলে। ক্ষমতার এই অপ-ব্যবহার নিবারণ করার কোন আইন নেই; একমাত্র তাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। সুতরাং পার্লা-মেণ্টারি ব্যবস্থায় সব সময় গণতন্ত্র রক্ষিত হয় না, বা ব্যক্তির মৌলিক নাগরিক অধিকার সমূহও রক্ষা করা যায় না। বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে কেবল যে হিটলারই "গণতান্ত্রিক" উপায়ে ক্ষমতায় এসেছিল তাই নয়, অনেক দেশের ডিক্টেটররাই এই রূপ গণতান্ত্রিক সমর্থনের দাবী

করে থাকেন, যদিও ক্ষমতালাভের পর তারা গণতন্ত্ররূপ মইটিকে লাথি মেরে সরিয়ে দেন।

পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের মূল ত্রুটির উদ্ভব ঘটেছে লিবারেল দর্শনের তত্ত্ব ও এর রাজনীতির অন্তর্বিরোধ থেকে। তত্ত্বের দিক থেকে মানবতাবাদী ঐতিহ্য অনুসারে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তিলাভই লিবারেলদের আদর্শ ; এই আদর্শ অনুসারে স্বাধীন মানুষ তার অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত না করে নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতা চালাতে থাকে ; ফলে, শক্তিমান শক্তিশালী হয়, আর দুর্বল মরে। রাজনীতিতে তখন সেই দুর্বলের দল নিতান্তই অসহায় ভাবে ধনীদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে দিন কাটাতে থাকে। এরূপ অবস্থায় রাজনৈতিক ও সামাজিক আচার আচরণে যখন লিবারেল দর্শনের নৈতিক আদর্শের মহত্ত্ব নস্ট হয়েছে তখন পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রও সর্বপ্রকার আস্থা হারাতে বাধ্য। আর তাই যদি নাই হবে তবে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানেব যুক্তিসঙ্গত ব্যখ্যাই বা কী আছে ?

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়, পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র তা সমাধান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা থেকেই জন্ম নেয় ফ্যাসিবাদ। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের ভিত্তি হল পরস্পব বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত সুতরাং অসহায় নির্বাচকমণ্ডলী। এটাই তার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি। ফ্যাসিবাদের কবল থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের এই ত্রুটি অবশ্যই দূর করতে হবে। সংহত ও সংঘবদ্ধ জনগণের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রই কেবল রাষ্ট্রের ওপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারে ; এবং এই রূপ সংহত গণতন্ত্রই হবে নতুম সমাজের

ভিত্তি। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রকে এইভাবে সংশোধন করতে পারলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অনেক নতুন পথ প্রগতিশীল মানুষের কাছে মুক্ত হবে। এই নতুন পথ একদিকে যেমন অনির্দিষ্ট কাল ধরে রক্ত ও অশ্রুপাত বন্ধ করবে, অন্যদিকে তেমনি শান্তিপূর্ণ পথে প্রগতি ও উন্নতির বিকল্প ব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রসূত যে সন্দেহ আছে তাও দূর করবে।

মানব সভ্যতার সূচনা থেকে যে সাংস্কৃতিক মূল্যমান এতদিন সঞ্চিত হয়ে এসেছে তা আজও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। অতীতের এই মূল্যবান ঐতিহ্যের দৃঢ়ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের নতুন সমাজের মহান সংগঠন। বিপ্লবীরা, রোমানটিসিষ্টরা, ইউটোপিয়ানরা, আদর্শবাদীরা এই রকম ষড়ৈশ্বর্যশালী এক সমাজের কথাই এতদিন কল্পনা করে এসেছে। যদি ধনতান্ত্রিক সমাজের গর্ভে সাম্যবাদের বীজ জন্মলাভ করতে পারে তবে মানবমুক্তির ভবিষ্যৎ দর্শনের সন্ধানও তথাকথিত বুর্জোয়া সংস্কৃতির মধ্য থেকেই উদ্ভূত হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কমিউনিষ্ট তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ-ব্যবস্থার অধোগতি

সারা দুনিয়ার পরিবর্তে মাত্র একটি দেশে (রুশিয়া) সর্বহারার পার্টি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে "সর্বহারা বিপ্লবের যুগ" শেষ হয়ে যায়। রুশ বিপ্লব, বিশেষতঃ বিপ্লবোত্তর সংগঠনের দিকটি ঠিক মার্কসীয় পরিকল্পনা অনুসারে ঘটেনি। এমন কি বিপ্লবের শুরুও মার্কসীয় ছক অনুসারে হয়নি। মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যদি বিপ্লব ঘটত তবে বিপ্লব ঘটা উচিত ছিল ইংলণ্ডের মত কোন শিল্প প্রধান দেশে, রুশিয়ার মত আধুনিক সভ্যতায় অনুন্নত দেশে নয়। রুশ বিপ্লব একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র, কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার যোগাযোগের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের যান্ত্রিকতার পথে ইতিহাসের গতি যে চলে না তা রুশবিপ্লবই প্রমাণ করে দিয়েছে। যন্ত্রশিল্পে উন্নত দেশেই সর্বহারা বিপ্লব ঘটবে—অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের এই নীতি অনুসারে যখন এই বিপ্লব ঘটল না, তখন এই নীতির বাঁধাধরা ছক অনুসারে যে বিশ্ববিপ্লব ঘটার কথা তাও ঘটল না। শুধু যে ঘটল না তাই নয়, পরিবর্তে অন্যান্য দেশে যে বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেওয়ার আশা করা গিয়েছিল, তাও ১৯২১ সালের পর নির্মূল হয়ে গেল।

তারপর থেকে রুশিয়ার বিপ্লবকে সম্পূর্ণ অজানা পথে হাতড়ে হাতড়েই চলতে হয়েছে। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে লেনিন দেখলেন, মার্কস সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্বন্ধে কিছুই লিখে রেখে যান নি। মার্কসীয় অর্থনীতির সবটাই সমালোচনামূলক। মার্কসের উদ্দেশ্য ছিল ধনতন্ত্রের কাঠামোর উলঙ্গ রূপটি তুলে ধরে তার অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতি, দ্বন্দ্ব-বিরোধটি দেখিয়ে দেওয়া। তার পরই তিনি এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের অনুমান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ধনতন্ত্র ঠিক সময়ে কাল পূর্ণ হলেই তার নিজ অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই ধ্বংস হবে এবং এই ধ্বংস স্তূপ থেকে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হবে। ইতিহাসের গতি যে মনুষ্যপ্রচেষ্টা ছাড়াই অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে, এ বিষয়ে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষের মত স্থির বিশ্বাস ছিল মার্কসের। সেইজন্য তিনি ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের (ইতিহাসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যা) নিয়ম অনুসারে সমাজতন্ত্রের সকল দিক গড়ে উঠবে উৎপাদন শক্তি নির্দেশিত হয়ে, সুতরাং সেখানে মানুষের করার কিছু নেই। ধনতন্ত্রের নিগড় থেকে বিপ্লব মানুষকে মুক্ত করবে। তার পর ভবিষ্যৎ আপন পথ ঠিকই খুঁজে নেবে। অর্থনীতিক হিসাবে মার্কস একজন সমালোচকই ছিলেন। তাঁর বিরাট গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোথাও সমাজ স্থপতির (সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) কলা-কৌশলের কোন পরিচয় নেই। ভবিষ্যতের জন্য যে কোন পরিকল্পনাকেই ইউটোপিয়া বলা চলে; এবং সকল প্রকার ইউটোপিয়াকেই মার্কস অতি কঠোর ভাষায় নিন্দা করে গেছেন। সেই জন্য সমাজতন্ত্র

গড়ে তোলার পূর্ব পরিকল্পিত নক্সা রচনা আর তাঁর দ্বারা হল না। লেনিন যখন তাঁর নিউ ইকনমিক পলিসি উপস্থিত করেছিলেন, তখন তিনি স্বীয় পক্ষ সমর্থনের জন্য বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি কথাও মার্কসের লেখায় নেই।

বিপ্লবের পরে রাজনৈতিক কর্মসূচী কি হবে, সে সম্পর্কেও মার্কস বিশেষ কিছু লিখে রেখে যান নি। রাষ্ট্রক্ষমতা হারিয়েও বুর্জোয়ারা সংগ্রাম চালাতে ক্ষান্ত হবে না; বুর্জোয়াদের এই প্রতিরোধ ক্ষমতা চূর্ণ করার অস্ত্র রূপেই মার্কস সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্যের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তারপর কী হবে, বিপ্লবোত্তর সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন কী রূপ নেবে, তার শাসন ব্যবস্থা কী ধরণের হবে, সে সব প্রশ্নের কোন জবাবই তিনি দিয়ে যান নি; এ সবই ইতিহাসের অজ্ঞেয় শক্তির দ্বারাই নির্দেশিত হয়ে চলার জন্য রেখে গেলেন। "রাষ্ট্র ক্রমে শুকিয়ে ঝরে পড়বে" এই ইউটোপিয়া দিয়ে রাজনৈতিক সমস্যাটাকে তিনি এড়িয়ে গেলেন। নতুন সমাজের অর্থনীতিতে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি "যথাশক্তি উৎপন্ন করুক, আর প্রয়োজন মত গ্রহণ করুক—from each according to his ability to each according to his need," এই এনার্কিষ্ট আদর্শটি গ্রহণ করেন। লেনিন একে "অর্থহীন শ্লোগান—useless slogan" বলে অভিহিত করেছিলেন।

গুরুর দোহাই দিয়ে (লেনিনের) স্তালিনী সংবিধানে মার্কসের এই নীতি সংশোধন করে লেখা হয়েছে, "যথা শক্তি উৎপন্ন করবে, কাজ অনুযায়ী মজুরী পাবে—from each according to his ability, to each according to his work"। পুরাতন নীতিটি

যদি অর্থহীন শ্লোগান হয় তবে তা সংশোধন করে যা দাঁড়িয়েছে তা সমার্থবাচক মনে হ'লেও বস্তুতঃ তা নয়। এই সংশোধনের দ্বারা নতুন সমাজ ব্যবস্থায় শক্তিতে ছোট-বড় তথা ধনের অসম বণ্টনকে সমর্থনই করা হয়েছে। কাজের যথাযোগ্য মূল্য নির্ধারণের ন্যায় সংগত প্রণালী আজও আবিষ্কৃত হয়নি। যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন তাঁরাই সে কাজটা করে থাকেন। তার ফল যে কী হয়েছে তা আজ সবাই জানছে।

বিপ্লবের পরে রুশিয়ায় যে রাজনীতি ও অর্থনীতি চলেছে তা কেবল বাস্তব ।সুবিধা-অসুবিধার নীতি দিয়েই নিয়ন্ত্রিত। তার কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল না, মার্কসবাদী দর্শনের নিয়মনীতি অনুসারেও তা চলে নি।* সুতরাং এ ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিষ্ট বলে দাবী করা নিতান্তই অযৌক্তিক। অন্যদিকে মার্কস যখন তাঁর সমাজতান্ত্রিক সমাজের গঠন কেমন করে হবে তার কোন রকম রূপরেখাই এঁকে যান নি, তখন যে কোন সমাজ ব্যবস্থার ওপরই কমিউনিষ্ট ছাপ মারা চলতে পারে। এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সোভিয়েট অর্থনীতি যে কমিউনিষ্ট নয় তা কারও পক্ষেই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। যে বৈপ্লবিক আদর্শের কল্পনা এতদিন রোমান্টিক বিপ্লবীদের প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে রুশিয়ার নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে তার কোন মিলই নেই। সোভিয়েট রুশিয়ার সোস্যালিষ্ট সমাজ

* সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীনে পরিচালিত কৃষি-শিল্প-বাণিজে শ্রমিক যা উৎপন্ন করে মার্কসীয় নীতি অনুসারে শ্রমিক তা পায় না। সেখানেও বাড়তি মূল্য (লাভ) surplus value রাষ্ট্র গ্রাস করে। সুতরাং সেখানে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র—State Capitalism চলছে বলা চলে।

(অনুবাদক

রাষ্ট্রের বাস্তবতার সঙ্গে এর আদর্শের এই গরমিলের ফলে কমিউনিষ্ট [বি]প্লবের প্রতি লোকের উৎসাহ অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। [এ]ই নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতার ফলে, পর পর কয়েকটা ঘটনা ঘটাকেই [তা]রা প্রগতি বলে মনে করে না, মনুষ্য জীবনে সেই ঘটনার ফলাফল [দি]য়ে প্রগতির তাৎপর্য বিচার করে, তারা আজ আত্মান্বেষণে প্রবৃত্ত [হ]য়েছে—কেন এমন হল ?

আজ আর বর্তমান ধনতন্ত্র কিংবা তার পরিবর্তে এক সমাজ [বি]প্লবকে বেছে নেবার প্রশ্ন নয় ; অর্থাৎ এক দিকে ফ্যাসিস্ত এক-[ন]ায়কত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের কুৎসিৎ শোষণ ও অত্যাচার, [আ]র অন্যদিকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সাম্যের ওপর [প্র]তিষ্ঠিত নতুন সমাজের আদর্শের মধ্যে একটি বেছে নেবার সমস্যা নয়। [দ্ব]ন্দ্বের রূপ আজ বদলে গেছে। আজ আমাদের বাছাই করতে [হ]চ্ছে, ভাবী সমাজের আদর্শ একদিকে, আর রুশ কমিউনিজমের [বা]স্তব রূপ অন্য দিকে—এ দুয়ের মধ্য থেকে একটিকে।

পূর্বে সামাজিক ন্যায়নীতির সমর্থকদের পক্ষ নির্বাচন কঠিন ছিল না। [কি]ন্তু রুশ বিপ্লবোত্তর যুগে স্বাধীনচেতা ব্যক্তির পক্ষে এ দুইয়ের মধ্যে [এ]কটিকে বেছে নেওয়া সহজ নয়। কমিউনিজমের বাস্তব রূপায়ণই যে [শু]ধু নৈরাশ্যজনক হয়েছে তাই নয়, অভিজ্ঞতার ফলে আদর্শটা আদৌ [সা]ম্য কিনা সে সম্বন্ধেও আজ সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আদর্শের সঙ্গে [বা]স্তব রূপায়ণের পদে পদে যদি এত তফাৎ হয় তবে সে চেষ্টার কী [কো]ন মূল্য আছে ? সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও [ক্র]মেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন [স]মাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও আরো বেশী লোক গভীর

ভাবে অনুভব করছে। বিপ্লবীদের মধ্যে এই যে আদর্শ ও বাস্তবে মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, এর ফলে কমিউনিষ্ট আন্দোলন ও এর সমর্থকদে মধ্যেও এক গভীর সংকট দেখা দিয়েছে।

যে সব কমিউনিষ্টদের চিন্তা ভাবনার শক্তি কম, তারা তাদে অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে পুরাতন গোঁড়া বিশ্বাসকেই আঁকড়ে থাকতে পারে কিন্তু অন্যেরা যারা সব বোঝে তারা শেষ আশা নিয়ে অপেক্ষায় রইল এই ভেবে যে, রুশিয়ায় যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা হয়তো সাম্রাজ্যবাদীদেব আক্রমণ আশঙ্কায় আপৎকালীন ব্যবস্থা রূপেই গ্রহণ করাব প্রয়োজনে হয়েছে ; অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশে বিপ্লব ছড়ি পড়লেই সেই সব আপৎকালীন ব্যবস্থাব অবসান ঘটবে। কিন্তু এ আশাবাদ বেশী দিন বজায় রাখা চলল না। বিপ্লব বিরোধী শক্তি জয়ের ফলে বিশ্ব-বিপ্লবের সকল আশা নির্মূল হয়ে গেল। তখন সু হল নতুন পথের সন্ধানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। একদিকে একাধিপা লাভের জন্য এক বাঁধাধরা ছকের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, অন্যদিকে বাস্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অদৃষ্টপূর্ব অবস্থার নতুন সমস্যা সমাধান করার জন্য সে বাঁধাধরা ছক ছেড়ে এক মৌলিক চিন্তা। শ্রমিক শ্রেণীর বাইরে যারা এতদিন বিপ্লবের সমর্থক ছিল তারা ক্রমেই সরে যেতে থাকল ফলে পৃথিবীর কমিউনিষ্ট আন্দোলনের শক্তি বহুল পরিমানে ক গেল এবং ক্রমে তা সোভিয়েট রাষ্ট্রের সুবিধা অসুবিধার নীতি দি পরিচালিত হতে থাকল। বিশ্ব-বিপ্লব ঘটানো আর তখন কমিউনি আন্দোলনেব উদ্দেশ্য রইল না, উদ্দেশ্য হয়ে উঠল রুশ জাতীয়তাবা রাষ্ট্রের ভাল মন্দের নীতি অনুসারে চলা। অবশ্য রুশিয়ার জাতী রাষ্ট্র নিজেদের সোস্যালিষ্ট রাষ্ট্র রূপেই নিজেদের জাহির করে থাকে।

কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালকে গড়ে তোলা হয়েছিল আসন্ন বিশ্ব-বিপ্লবকে সহায়তার জন্য। কিন্তু কমিউনিষ্ট আন্দোলনের এই সংকটে প্রথম বলি পড়ল, সেই কমিউনিষ্ট ইন্‌টারন্যাশন্যালই। বিপ্লবের পূর্বে কমিউনিজমের সামনে যে সব সমস্যা ছিল, বিপ্লবের পরে সে সবের পরিবর্তে দেখা গেল অন্য সব নতুন সমস্যা। এই দুই বিপরীতধর্মী সমস্যা সমাধানের চেষ্টার টানা-হেঁচড়ার মধ্যে পড়েই কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের অপমৃত্যু ঘটল। অর্থাৎ কমিউনিজমের তত্ত্ব ও প্রয়োগ ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলেই এটা ঘটল। কমিউনিষ্ট আন্দোলনে একমাত্র রুশ কমিউনিষ্টরাই ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছিল, সেই জন্য ইনটারন্যাশন্যালের নেতৃত্বটা পুরোপুরি তাদের হাতেই এসে গেল। অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি সমূহকে যখন ক্ষমতার বাইরে থেকে বিপ্লবের আয়োজন করতে হচ্ছিল, তখন নিজ নিজ দেশের অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার তারা স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে রুশ পর্টির তাঁবেদার হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে নিজ নিজ দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সর্বনাশ ঘটাল। ধরে নেওয়া হ'ল রুশ কমিউনিষ্টরা যে কেবল কমিউনিজমের প্রয়োগ কৌশল সম্বন্ধে দক্ষ তাই নয়, তত্ত্ব সম্বন্ধেও তারা একমাত্র উপদেষ্টা। বিপ্লবের পরে অপ্রত্যাশিত নতুন সব সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন চিন্তা ভাবনার পরিবর্তে মার্কসের তাত্ত্বিক অনুমান মাত্রকে অপরিবর্তনীয় অনুশাসনের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হল। তার ফলেই মার্কসবাদ আজ এক অপরিবর্তনীয় অনুশাসন বা Dogmaতে পরিণত হয়েছে। প্রথম সর্বহারা বিপ্লবের ফলে রুশিয়াতে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল, তার স্বার্থেই বিশ্ব-বিপ্লবকে বলি পড়তে হল। একটি দেশেই সমাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠার আদর্শ আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের আদর্শলাভের পরিপন্থী হয়ে উঠল।

সোভিয়েট রিপাবলিক এক প্রকার নতুন ধরণের জাতীয় গৌরবাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায়, আন্তর্জাতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তাকে বাধ্য হয়েই জড়িয়ে পড়তে হল। রুশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হয়ে গেল সোস্যালিজম বা কমিউনিজম রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র (State Capitalism) ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীর অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যারা নিজেদের মধ্যেকার অন্তর্বিরোধের ফলে নিজেরাই ভেঙ্গে পড়ছিল, যাদের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা বেশী ছিল না, রুশিয়ার কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র তার জাতীয় গৌরবাকাঙ্ক্ষার জন্য তাদের দলেই ভিড়ল বটে, কিন্তু তাতে স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা কারোরই বাড়ল না। দুই ধরণের জাতীয় গৌরবাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিরোধিতাও ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিরোধিতার চেয়ে কিছু কম নয়—যদিও এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কোন মতবাদের কোন বালাই নেই। সারা জগৎ আজ বিপ্লব ও প্রতি বিপ্লবের শিবিরে বিভক্ত না হয়ে, হয়েছে দুই রকমের জাতীয় গৌরবাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বে। এর ফলে পুনরায় এক সামগ্রিক মহাযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যুদ্ধ যদি একান্তই বাধে, তা হলে সমগ্র মানবজাতটাই হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। এই মহাভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে উদ্ধার পাবার কি কোন উপায় নেই? ইতিহাসে তবে কী আর একটি সভ্যতার বিলুপ্তির কথা একান্তই লেখা হবে?

আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে হলে কমিউনিজমের প্রতারণাপূর্ণ, ভাঁওতা সর্বস্ব আদর্শকে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজন ক্ষমতায় আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে—মানুষের সে

শক্তি আজো অটুট আছে। নব যুগের যাঁরা হবেন অগ্রদূত, তাঁদের কার্ল মার্কসের অবতার সুলভ দৈবাদেশ প্রতিম তত্ত্বাবলীকে পরিত্যাগ ক'রে, নতুন সমাজ সংগঠনকারী সমাজ-স্থপতির কলাকৌশলের (with social technology and social engineering) সাহায্যে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে ; সে সমাজে অর্থনৈতিক যোজনার সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতার, সমগ্র সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সামাঞ্জস্য বিধান ঘটবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মার্কসবাদের গোত্র-লিবারেল মতবাদ

ধনতন্ত্রের মার্কসীয় বিশ্লেষণ ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্র অনিবার্য ভাবেই ধনতন্ত্রকে সরিয়ে সেই শূন্য স্থান পূরণ করবে, এই তত্ত্ব যে একান্ত আকাশ কুসুম চিন্তা তাও সেই সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যাই মার্কসবাদকে আজ এই শোচনীয় অবস্থায় এনে ফেলেছে। যে ইতিহাসের গতিতত্ত্ব মনুষ্য জীবনের অন্যান্য শক্তি সমূহকে বিশেষতঃ ভাব ও ভাবনার শক্তিকে অস্বীকার ক'রে ধনোৎপাদনের শক্তিকেই মনুষ্য জীবনের একমাত্র নির্দেশক ও পরিচালক স্বরূপ মনে করে এবং সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্ণয়ে সর্বজনগ্রাহ্য সদাচরণের এক নিয়ম-কানুন মেনে চলার (মর্যালিটির) প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে, তা কখনোই সুস্থ্য সমাজ সংগঠনের পক্ষে নির্ভর যোগ্য পথ প্রদর্শক রূপে গণ্য হতে পারে না। মার্কসের ঐতিহাসিক নিয়তিবাদ (অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ) বাস্তব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। সভ্য জগতকে বর্তমান সংকট ত্রাণের পথ দেখাবার জন্য আরো ব্যাপক এক ইতিহাসের নতুন গতি বিজ্ঞান প্রয়োজন। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক মতবাদ ও নৈতিক তত্ত্ব যদি

অর্থনৈতিক জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে না পারে তবে তা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ও প্রতারণা মূলক হতে বাধ্য।

গোড়ার দিকে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে নৈতিক আবেদনের অভাব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে এ আন্দোলনের যাঁরা পথ প্রদর্শক তাঁরা ধনতন্ত্রকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন তাব দুর্নীতির জন্যই। নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবীর পিছনে যে প্রেরণা ছিল তা ছিল নৈতিক প্রেরণা। ন্যায় নীতির ওপর স্থাপিত সামাজিক ব্যবস্থার দাবীর উৎপত্তি যে নীতিতত্ত্ব থেকেই তা সুস্পষ্ট। মার্কস তাঁর পূর্বসূরীদের কল্পনা বিলাসী বলে বিদ্রূপ করেছেন এবং নিজে সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছেন বলে দাবী জানিয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁর আবিষ্কৃত অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ তত্ত্বের ওপর জোর দিতে গিয়ে ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর মূলতঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এক নিয়তিবাদে পরিণত করেছেন। তাঁর মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ মানুষের চেষ্টায় গড়ে উঠবে না, অর্থনৈতিক উৎপাদন শক্তির দ্বারা নির্দেশিত হয়ে আপনা আপনি অনিবার্যভাবেই তা গড়ে উঠবে ; কারণ সমাজতন্ত্র হচ্ছে সমাজ বিবর্তনেব এক অপরিহায ও অনিবার্য পরিণতি মার্কস দাবী করেন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতই নির্ভুল। ইতিহাসের নিয়মগুলি জানা থাকলে, ধনতন্ত্রের পর যে সমাজতন্ত্র অনিবার্য ভাবেই আসবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, এবং তিনি সে নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নিউটনের পর লা প্লাসের আবির্ভাব হয়েছিল, নিউটনের আবিষ্কার সমূহকে গাণিতিক নির্ভুলতার সঙ্গে প্রমাণ করার জন্য ; কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানের "নিউটনের" পর তাঁর আবিষ্কার সমূহকে নির্ভুল প্রমাণ

করতে কোন "লা প্লাসের" জন্ম হ'ল না। মার্কসের ভুল ধরা পড়ে গেল। মার্কস যে একজন মেকী অবতার—**false prophet**—তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

তথাপি বলব, মার্কসের গোঁড়া ভক্তরা যেমন প্রচার করে থাকেন, তিনি তেমন ইতিহাসের গণিত সর্বস্ব শুষ্কহৃদয় পণ্ডিত মাত্র ছিলেন না। তিনি একজন অতি আবেগ প্রবণ মানবতাবাদী পুরুষ ছিলেন; সেই সঙ্গে তাঁর ছিল বিপ্লব সংগঠন করার ওপর দৃঢ় প্রত্যয়। অর্থাৎ তিনি যখন মানুষের সৃজনী শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন, তখন তিনি একজন রোমান্টিক মানুষও ছিলেন! বিপ্লবের ভাব ও ভাবনা হ'ল রোমান্টিক ভাব ও ভাবনা। কারণ বিপ্লবের মুল স্বীকার্য তত্ত্ব হল, মানুষ পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তুলতে সক্ষম। মানুষের এই পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে গড়ে তোলার সৃজনী ক্ষমতাকে বাদ দিলে সামাজিক প্রগতি কেবল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালিত বিবর্তন মাত্র হয়; সময় সময় সমাজ বিবর্তনের গতিবেগ বাড়িয়ে হঠাৎ মহাবিবর্তন ঘটানর অর্থাৎ সমাজে বিপ্লবের কোন স্থানই থাকে না। মার্কস যদি বিপ্লবের গুরুদেব হন তবে তিনি একজন রোমান্টিসিস্টও বটেন। তিনি মানুষের সৃজনী ক্ষমতার ওপর গভীর আস্থা ঘোষণা করে গেছেন। মানুষের এই সৃজনশীলতাই সমাজ-বিবর্তনের গতিবেগকে বাড়িয়ে দিয়ে বিপ্লব ঘটায়। মার্কস একজন মানবতাবাদী, তাই তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্বের মূল আকর্ষণ হল গভীর নৈতিক আবেদন। মার্কসের যে সকল সমালোচক সম্যক দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে বিচার করেন তাঁরাও তাঁর গভীর সত্যানুসন্ধিৎসা ও একান্ত সততার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন। অতিশয় উচ্চস্তরের নীতিবোধ ও অন্যায়ের প্রতি গভীর বিরক্তি ন

থাকলে শোষিত ও অত্যাচারিতের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এমন একক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না।*

সর্বপ্রকার নৈতিক কপটতা ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে মার্কস ছিলেন খড়্গ হস্ত। তাঁর স্বজাতীয় ইহুদী ধর্মপ্রচারকদের মতই তিনি ছিলেন এক মহান নীতিবাগীশ। তিনি ধনতন্ত্রের যে নির্মম বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাতে ধনতন্ত্রকে দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগেই অভিযুক্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাঁর "ক্যাপিটেল" গ্রন্থখানি একটি সামাজিক ন্যায়-নীতি সংক্রান্ত পুস্তক, যার মধ্যে আছে শ্রমশীল নরনারীর দাসত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। বর্তমান অসাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার সমর্থকদের নৈতিক ভণ্ডামীর প্রতি মার্কসের ছিল গভীর ঘৃণা। এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ সেই জন্যই তাঁর অর্থনীতির পিছনে যে নৈতিক আবেদন ছিল তার ওপর তিনি ইচ্ছা করেই জোর দেন নি, তথাপি এটা স্বীকার করতেই হবে, সম-সাময়িক ইতিহাসের ওপর মার্কসের যে প্রভাব তা একজন নীতিবেত্তা হিসাবেই। একমাত্র তাঁর গোঁড়াভক্তরাই মনে হয় সে প্রভাব থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মার্কসবাদ আজ এক সর্বগ্রাসী একনায়কত্বের মতবাদে পরিণত হলেও, মানবতাবাদী হিসাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সমর্থক। সমাজতন্ত্রকে তিনি "স্বাধীনতার স্বর্গ" রূপে বর্ণনা করেছেন ; সে স্বর্গে মানুষ হবে তার সামাজিক পরিবেশের প্রভু। এমনি ধারা মানবতাবাদী মতবাদের

---

*এখানে রায় মার্কসের জীবনকে দিয়েই মার্কসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্য বাদ খণ্ডন করে নিজের ইতিহাসের গতিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করছেন।

(অনুবাদক)

যিনি প্রবক্তা তিনি কোন শ্রেণী বিশেষের—এমন কি তা সর্বহারা শ্রেণী হলেও—সমষ্টি সত্তার পূজারী হতে পারেন না। মার্কসের মতে, বর্তমানে যে অযুক্তির শক্তি মানুষের জীবনকে সন্ত্রস্ত করে রাজত্ব করে চলেছে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে মানুষের যুক্তি সেই অযুক্তির শক্তিকে পরাভূত করবে এবং যেহেতু মানুষ যুক্তি পরায়ণ সেই হেতু যুক্তির সাহায্যেই সে তার ভাগ্যকে নির্ধারিত করে চলবে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, মার্কাসবাদকে তার অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে পারলে মার্কসবাদের মানবতাবাদী, ব্যক্তিস্বাধীনতাকামী, নীতিপরায়ণ ঐতিহ্য আমাদের নতুন দর্শনের প্রধান উপাদান হতে পারে।* সমগ্র মানব সংস্কৃতির সঞ্চিত ভাণ্ডারে মার্কসবাদের স্থায়ী মূল্যে মূল্যবান অংশটিও জমা পড়েছে। ভবিষ্যৎ

*রায়বাদকে বোঝার সুবিধা হয় মার্কসবাদ থেকে অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদকে বাদ দিয়ে দেখলে। যদিও মার্কসবাদের মূলস্তম্ভ চারটি, যথা : (১) অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ ; (২) দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ; (৩) শ্রেণী সংগ্রাম তথা সর্বহারার এক নায়ক-তন্ত্রের তত্ত্ব ; (৪) বাড়তি মূল্য তথা বিপ্লবের তত্ত্ব, তথাপি এটা ঠিকই যে অর্থ-নৈতিক নির্দেশ্যবাদই হ'ল সর্বপ্রধান স্তম্ভ এবং এর ওপরই নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে আর তিনটি স্তম্ভ।

মূল স্তম্ভ অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের তত্ত্বটি যদি যুক্তি পরায়ণ মুক্তিকামী মানুষের সৃজনশীলতার তত্ত্ব দিয়ে খণ্ডন করা যায়, তা হলে মার্কসের অপর তিনটি স্তম্ভ আপনিই ভেঙ্গে পড়ে।

মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির তত্ত্ব অনুসারে সমাজের গতি চলে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে। সমাজের উৎপাদনের উপায়-পদ্ধতি মানুষের ওপর ক্রিয়া করে, মানুষ প্রতিক্রিয়া জানায় এবং এই দুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের ফলে এই দুই শক্তি শেষ হয়ে সমাজে এক নতুন উৎপাদনের উপায়-পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ পরিবেশের

মাজ সংগঠকগণ তাঁদের মালমশলা সংগ্রহের সময় অতীতের অন্যান্য
াবদানের সঙ্গে মার্কসবাদ থেকেও প্রয়োজন মত উপাদান
ংগ্রহের দাবী করতে পারবেন।

মার্কসবাদের প্রকৃত মূল্যবান অংশটির মূল্যায়ণ করতে হলে
। তার লিবারেল ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হবে।
ার্ণষ্টীন শোধনবাদী ছিলেন না। মার্কসবাদ যে লিবারেল মতবাদেরই
ক্তিসঙ্গত পরিণতি, এই কথা বলে তিনি কেবল সোস্যালিজমের বংশ

াতি মানুষের প্রতিক্রিয়া বাঁধা ধরা পথে একই রকম হবে (অর্থনৈতিক
ার্দেশ্যবাদ অনুসারে), অন্য কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া জানাবার ক্ষমতা মানুষের
নই।

পক্ষান্তরে যদি ধরা যায়, সমাজের গতিবেগ এনে দেয় মুক্তিকামী, যুক্তি-
ল, সৃজনক্ষম মানুষ, যে নিজ দেহযন্ত্রের ক্ষমতা ও নিয়মের বশেই চলে,
রিবেশ যাকে নিয়ন্ত্রিত করে না, বা যার চলাফেরা চিন্তাশক্তিকে নির্দেশিত
রে না এবং যে কলের মত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে পরিচালিত
য় না; যে নিজ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ক'রে জীবনকে সম্ভোগ করার তাগিদে,
রিবেশ ও প্রকৃতির নিয়মকানুনের তত্ত্বটি আয়ত্ত ক'রে নিজের কাজে লাগায়,
রিবেশকে বদলে দেয়, তা হলে মার্কসীয় দ্বন্দ্বপদ্ধতির তত্ত্ব খণ্ডিত হয়।

তৃতীয় স্তম্ভঃ—সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বা পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাত
াকলেও সমাজে ভারসাম্য রক্ষার জন্য যুক্তি পরায়ণ সৃজনশীল মানুষ এক সর্বজন-
াহ্য নৈতিক অনুশাসনের আবিষ্কার করেছে। এই সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক
নুশাসনের কথা যখন মানুষ ভোলে তখনই সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণীতে
শ্রণীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব বিরোধ দেখা দেয়। তখন এর প্রতিবিধান এক-
ায়ক তন্ত্র স্থাপন ক'রে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে গায়ের জোরে বিলোপ
াধন ক'রে হয় না। ইতিহাসে কোনদিন তা হয় নি। মনুষ্য সমাজের চিরন্তন
ীতি হল সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন প্রবর্তন ক'রে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে
মাজকে পুনর্গঠিত ক'রে এ সমস্যার সমাধান করা। সুতরাং তৃতীয় স্তম্ভও
াড়াতে পারে না।

বৃত্তান্তটাই দেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি যে বলেছিলেন, সোস্যালিজম বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠলে তাকে সংগঠিত লিবারেলিজম বলা চলবে। তাঁর এই যুক্তির তাৎপর্য বুঝতে এখনো বাকী আছে। লিবারেলিজম ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি ঘোষণা করে। কিন্তু তা কেবল সংবিধানেই লেখা থাকে, এবং কার্যতঃ সে নীতি পরিত্যক্তই হয়। সেই নীতিকে কার্যে রূপায়িত করে তোলাই ছিল সোস্যালিজমের অঙ্গীকার।

মার্কসের অর্থনীতির মধ্যেও তাঁর লিবারেল বংশ পরিচয় স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। "অর্থ নৈতিক. মানুষ"— ইকনমিকম্যান *লিবারেলদের ধারণা ; আর এই ধারণা থেকেই মার্কসের ইতিহাসের অর্থ নৈতিক

চতুর্থ স্তম্ভ বাড়তি মূল্য ও বিপ্লবের তত্ত্ব। মানব সভ্যতার আদিকাল থেকেই এই বাড়তি মূল্য সামাজিক সঞ্চয় রূপেই গণ্য হয়ে এসেছে। সমগ্র সমাজের উন্নতি ও সেবায় এই সঞ্চয় ব্যয়িত না হয়ে ব্যক্তির ভোগে কেন ব্যয়িত হবে, এই প্রশ্ন থেকেই মার্কসের এই তত্ত্বের অবতারণা। কিন্তু যুক্তিপরায়ণ সৃজনশীল মানুষ যদি সমাজে সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন পুনরায় প্রবর্তন করতে পারে তা হলে এই বাড়তি-মূল্য রূপ সামাজিক সঞ্চয়টি ব্যক্তির ভোগে না লেগে সমাজের কল্যাণেই ব্যয়িত হবে; এবং ধনতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক (সমাজতন্ত্র) অর্থনীতির পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে শোষণ-শাসন মুক্ত সমবায় মূলক অর্থনীতি প্রবর্তনের দ্বারা সেটা সম্ভব হবে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর যুক্তিপরায়ণ সৃজনশীল মানুষের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্থাপন হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি অনুরূপ ভাবে রূপায়িত হয়ে উঠবে। মার্কসের চতুর্থ স্তম্ভও টেকে না।

অতএব মার্কসের প্রথমস্তম্ভ, অর্থ নৈতিক নির্দেশ্যবাদকে যদি সৃজনশীল যুক্তি পরায়ণ স্বয়ংশাসিত মুক্তিপিয়াসী মানবতত্ত্ব দিয়ে খণ্ডন করা যায় তা হলে মার্কসের অপর তিনটি স্তম্ভও ধবসে পড়ে। [অনুবাদক

*এই "ইকনমিক ম্যান" অর্থে মানুষকে কেবল মাত্র জীবধর্মী প্রাণী পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়। অর্থাৎ অন্যান্য জীবের মত মানুষও কেবল আহার নিদ্রা মৈথুন সর্বস্বজীব, যাদের মূল্যায়ন হয় স্থূল উপযোগ বা টাকা পয়সার মাপকাঠি দিয়ে। (অনুবাদক

নির্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যা। মার্কসীয় অর্থনীতির মূলভিত্তি হ'ল শ্রমের পরিমানের সাহায্যে মূল্য নির্ধারণের নীতি। লিবারেল অর্থনীতিবিদ রিকার্ডোর নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এটি পাওয়া। ধনতন্ত্রে লাভ খাওয়াকে মার্কস যে বাড়তি মূল্যের নীতি রূপে চিহ্নিত করেছেন তাও উপরিউক্ত শ্রমের পরিমানের সাহায্যে মূল্য নির্ধারণ নীতিরই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। প্রকৃত পক্ষে এই বাড়তি-মূল্যের উল্লেখ গ্রে, হজস্কিন, টমসন প্রমুখ সে কালের ইংরেজ সমাজতান্ত্রিকদের লেখায় দেখা যায়। মোট কথা, প্রাচীন ইংরেজ অর্থনীতিকদের কঠোর সমালোচনা করলেও তা থেকেই যে মার্কস অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার সমালোচনা ছিল একান্তই গঠন মূলক। উদ্দেশ্য ছিল. সমালোচিত অর্থনীতিকে দোষ ত্রুটি মুক্ত করে তার সার বস্তুর ওপর এক উন্নততর তত্ত্বের কাঠামো গড়ে তোলা। লিবারেল অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ বলেছিলেন, "অধিকাংশ মানুষের ভাব ও ভাবনা গঠিত হয় তাদের জীবিকার দ্বারা।" এই বুর্জোয়া অর্থনীতির জনক বহু বৎসর পূর্বেই মার্কস কথিত, "মানুষের ভাব ও ভাবনা তার জীবিকার্জনের হাতিয়ারের দ্বারাই নির্ধারিত হয়," মতবাদটি অনুমান করতে পেরেছিলেন।

নীতিতত্ত্বের ব্যাপারে মার্কস বুর্জোয়া হিতবাদকেই *অনুসরণ করে এসেছেন। হিতবাদের জনক বেন্থাম বলেছিলেন, আবেগ প্রধান ও কৃচ্ছ্রধর্মী নৈতিক আচার-আচারণ মধ্যযুগীয় অভিজাত সভ্যতার নীতি; সুতরাং আধুনিক যুগের পরিবর্তিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

*হিতবাদ নীতির প্রধান কথা হল, অধিকাংশের অধিকতর মঙ্গল—the greatest good to the greatest number. (অনুবাদক)

পরিবেশে সে নীতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। র‍্যাডিক্যাল্ নামে খ্যাত সে কালের এক শ্রেণীর হিউম্যানিষ্ট দার্শনিক নীতিতাত্ত্বি সমস্যাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছিলেন সমাজের স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থকে বলি দেওয়া তাঁরা সুনীতি বলে মে নিতে রাজী ছিলেন না। আজ্ঞানুবর্তিতা ও নম্রতা যে সদগুণের মং তা গণ্য না করে তাঁরা বলেছিলেন ব্যক্তির অধিকার-ও স্বার্থরক্ষা মধ্য দিয়েই সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হতে পারে। কি সমাজে যদি ন্যায় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয় তবে তা সম্ভব হতে পারে বিভিন্ন ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে সংঘাত ও দ্ব বিরোধ নিরাকরণের দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান করে ও সমাজে ভারসাম্য রক্ষ ক'রে x অপরদিকে মার্কস তাঁর মানবতাবাদী মত ভুলে গি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মুক্তিকামী মতবাদকে বুর্জোয়া ধনীদের মনগড় অবাস্তব ধারণা বলে পরিত্যাগ করলেন।

হেগেলের প্রভাবেই মার্কস নৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যক্তি কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করেন। হিতবাদীগণের ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজিক প্রশ্নগুলি বিচারের আপেক্ষিক নীতিতত্ত্বকে (অর্থাৎ ব্যক্তি অনুসারে নিজ নিজ নৈতিক মাপকাঠি), কার্য-কার নিয়মানুসারে যুক্তিযুক্ত বলা চললেও মার্কসের বেলায় কিন্তু তা বল চলে না। মার্কসের এই আপেক্ষিক নীতিতত্ত্বে মুক্তির একটা আবর থাকলেও তা অন্ধ বিশ্বাস মাত্র—dogmatic, তা হেগেলের মর‍্যাদ

*উল্লিখিত র‍্যাডিক্যালদের উপরিউক্ত মতে কেবল ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার কথা বলা হয়েছে, সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসনের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করা হয়নি। সুতরাং তার দ্বারা এর সত্যকে অস্বীকার করা হল।

পজিটিভিজিম তত্ত্বের (বাস্তব নীতিতত্ত্ব) ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ মাত্র। অর্থাৎ হেগেলে যা ছিল বর্তমান, মার্কসে তাই হল ভবিষ্যৎ। জোর-যার-মুলুক-তার নীতিকে তুলে ধরার জন্য হেগেল 'দুর্নীতি' কেই যুক্তির দ্বারা খাড়া করতে চেয়েছিলেন।

যে হেতু হেগেলের বাস্তব নীতিতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল, সমাজে সর্বজন গ্রাহ্য কোন নৈতিক মানদণ্ড নেই, যা আছে তা যুক্তি সঙ্গত বলেই আছে, সুতরাং তা ভাল, এবং তাই স্বীকার্য, সেই হেতু এই মত নৈতিক নাস্তিক্যবাদ (nihilism) ছাড়া কিছু নয়। এই দিক দিয়ে হেগেলের বাস্তব নীতিতত্ত্বের সঙ্গে মার্কসের আপেক্ষিক নীতিতত্ত্বের কোন প্রভেদ নেই। হেগেল বলছেন, 'জোর-যার-মুলুক-তার' নীতির রূপায়ণেই পরিদৃশ্যমান সমাজ। মার্কস হেগেলের এই মতকে ভবিষ্যতের সমাজ সংগঠন পরিকল্পনার মধ্যে প্রয়োগ করে বললেন, 'জোর-যার-মুলুক-তার' নীতিরই বাস্তব রূপায়ণ হবে ভবিষ্যৎ সমাজ। হেগেল, বলেছিলেন: যা দেখছ তাই যুক্তি সঙ্গত, সুতরাং তা ভাল। মার্কস তার সঙ্গে যোগ করলেন: যে ভবিষ্যৎ আমি দেখছি, তা বর্তমানেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি; অতএব তা যুক্তি সঙ্গত ও ভাল হবে। অন্য কথায়, জোর-যার-মুলুক-তার নীতি যদি বর্তমানে সত্য হয়, তবে ভবিষ্যতেও তা সত্য হবে। মার্কসের ভবিষ্যৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কমিউনিষ্টদের বর্তমান হয়েছে। সুতরাং নৈতিক বিষয়ে মার্কসবাদীদের আচরণ বাস্তব নীতিতাত্ত্বিক পজিটিভিষ্টদের মতই হয়েছে।

নৈতিক সমস্যা সমাধানে মার্কসবাদের মধ্যে হেগেলের প্রভাব কমিউনিষ্টদের ক্ষমতা দখলের অভিজ্ঞতার দ্বারাই অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রুশিয়ায় আজ হেগেলীয় নীতি অনুসারে ধরে নেওয়া

হচ্ছে, যা কিছু নতুন ঘটছে তা ভাল ; নতুন ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য যা করা যায় সেটাই নীতিসিদ্ধ মর‍্যাল, জোর যার, মুলুক তার। এই হেগেলীয় বাস্তব নীতিতত্ত্ব কেবল কমিউনিষ্ট শাসিত রুশিয়াতেই আবদ্ধ নেই, পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্টরাও এই পথের পথিক। ফলে, কমিউনিষ্ট অন্দোলন আজ নৈতিক অধঃপতনের তলায় তলিয়ে গেছে. এবং সেই সঙ্গে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ও সভ্যতার বিরুদ্ধে যে সকল অসংখ্য বিদ্রোহী লড়াই করে চলেছে তাদের নিকটেও তারা আস্থা হারিয়েছে। এই রূপ বিদ্রোহীদেব সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সকল শ্রেণী থেকেই তারা আসছে। এদের অধিকাংশ আসছে সর্বহারা শ্রেণীর বাইরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে। মার্কসের যে বাণী ছিল, সমাজের শ্রেণী-সমূহ দুইদলে বিভক্ত হয়ে সংগ্রামের জন্য মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা কিন্তু আজো ঘটেনি। সুতরাং তিনি যে ভাবে বিপ্লবের পরিকল্পনা করেছিলেন, বিপ্লব সে ভাবে ঘটবে না।

দ্বান্দ্বিক নিয়মের মোহ কাটাতে না পারার ফলে মার্কস হেগেলের প্রভাব থেকে কোন দিন মুক্ত হতে পারেন নি। এ জন্যই তিনি তাঁর প্রথম জীবনে র‍্যাডিক্যাল দার্শনিকদের প্রভাব থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। র‍্যাডিক্যাল দার্শনিকদের নৈতিক আদর্শে যে ত্রুটিই থাকুক তাদের কিন্তু বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা বড় আবেদন ছিল এই ব্যক্তি কেন্দ্রিক আদর্শের মধ্যে। প্রথম দিকে মার্কসের বিপ্লবের আদর্শের মধ্যেও তাই ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে, মার্কসবাদের সেই মর্মবাণীটি মার্কসের গোঁড়া ভক্তের দল একেবারে ভুলে গিয়ে মার্কসবাদকে এক ধর্মে পরিণত ক'রে, এক রাজনৈতিক জেস্যুইটের দল গ'ড়ে, তাদের মতই জোর ক'রে অপর সব মনুষের ওপর নিজেদের ধর্মমত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে চলেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মার্কসবাদী বিপ্লবের তত্ত্ব

ধনতন্ত্রের বিশেষ লক্ষণ বাড়তি মূল্যের উৎপাদন এবং তার দ্বারাই শ্রমজীবী শ্রেণীকে শোষণ করা হয়, এই নীতি শুধু যে মার্কসীয় অর্থনীতির প্রধান ত্রুটি তাই নয়, মার্কসীয় বিপ্লব তত্ত্বেরও এটি প্রধান গলদ। উৎপাদনকারীকে তার পরিশ্রমের আংশিক মূল্য থেকে বঞ্চিত করা শুধু ধনতন্ত্রের একারই বৈশিষ্ট নয়। সভ্যতার সূচনা থেকেই দেখা যায় যে সমাজের সমস্ত উৎপাদনটাই ভোগ কবে ফুরিয়ে দেওয়া হয় না। এই বাড়তি উৎপাদনের উপর নির্ভর করেই সমাজের প্রগতি. বিশেষ করে উৎপাদন যন্ত্রের ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়ে এসেছে। এই বাড়তি উৎপাদনকে বলা যেতে পারে সামাজিক সঞ্চয়। এই সামাজিক সঞ্চয়ের ফলেই যুগে যুগে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। মার্কসীয় অর্থনীতিতে যাকে বাড়তি মূল্য বলা হয়েছে, প্রকৃত-পক্ষে তা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদিত সামাজিক সঞ্চয়।

অর্থনীতির ইতিহাসের অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন মার্কস। সেই জন্য বাড়তিমূল্যের প্রয়োজনীয়তা এবং তার প্রগতিশীল সামাজিক তাৎপর্য তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। অর্থনীতির দিক থেকে বাড়তি মূল্যের উৎপাদন বন্ধ করা শুধু অবাস্তব নয়, আত্মহত্যার সামিল।

বাড়তি মূল্যের উৎপাদন বন্ধ করলে সামাজিক সঞ্চয়ও লোপ পাবে ; ফলে ইন্ধনের অভাবে সমাজের অগ্রগতিও রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং সর্বশেষে তা ভেঙ্গে পড়বে। এই সামাজিক সঞ্চয়ের অপর্যাপ্ততা বা অল্পতার ফলে একাধিক প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে।

মার্কস তাঁর অর্থনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে, "ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাড়তি মূল্যের উৎপাদন।" অবশ্য সেই সঙ্গে স্পষ্টভাবে বলেননি, এই বাড়তি মূল্যের উৎপাদন বন্ধ করতে হবে, যদিও "শ্রমিক শোষণ" যদি সত্যই বন্ধ করতে হয় তবে অবশ্যই তা করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক অর্থনীতিব মধ্যে যুক্তিসম্মত ভাবে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই বাড়তি মূল্যের সূত্র থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে যে রাজনৈতিক তত্ত্ব উত্থাপন করলেন তার দ্বারাই পরোক্ষভাবে তিনি আমাদের কাছে প্রস্তাবটিকেই তুলে ধরলেন। বাড়তি-মূল্য উৎপাদনের অর্থ শ্রমিক "শোষণ" ; কারণ তার ফলে উৎপাদক তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য থেকে বঞ্চিত থাকে ; আবার যে কোন অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাতেই প্রগতিকে রুদ্ধ না করে বাড়তি-মূল্যের উৎপাদন বন্ধ রাখা যায় না ; অর্থাৎ সকল উৎপাদনটিকেই ভোগ করে ফুরিয়ে ফেলা চলে না, কিছু সঞ্চয় করতেই হয়। এই সব দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মার্কস বললেন, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যে বাড়তি-মূল্য উৎপাদিত হয় তাতে শ্রমিক শোষণই বোঝায়, কেননা সে বাড়তি মূল্য একটি শ্রেণীই আত্মসাৎ করে। এই ভ্রান্তিপূর্ণ মতের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে তিনি দাবী করলেন, সামাজিক সঞ্চয়ের ওপর একটি বিশেষ শ্রেণীর মালিকানা লোপ করতে হবে। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ

বন্ধ করতে হ'লে, আত্মসাৎকারীদের ধন-সম্পদই আত্মসাৎ করতে হবে।

সামাজিক সঞ্চয়ের উপর একটি বিশেষ শ্রেণীব মালিকানার ব্যবস্থা অবশ্যই অবাঞ্ছনীয়। সে ব্যবস্থা অবশ্যই লোপ কবতে হবে। কিন্তু এ দাবীর প্রেরণাটা অর্থনৈতিক নয়, নৈতিক ; এ দাবী সমাজে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার দাবী। কিন্তু এ দাবী মার্কসেব বিপ্লব-তত্ত্বেব দ্বারা তোলা যায় না। মার্কসের অর্থনীতি ও বিপ্লব-তত্ত্বের মধ্যে যে এই ভুল আছে তা অভিজ্ঞতার দ্বারাই ধরা পড়েছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাতেও যে সামাজিক সঞ্চয় উৎপাদিত হবে তা অস্পষ্ট ভাবে স্বীকার কবা হয়েছে, কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর দ্বারা যে আত্মসাৎকারীদের ধন সম্পদ আত্মসাৎ করা হবে তা অতি স্পষ্ট ভাষাতেই বলা হয়েছে। এর অর্থ হল, যতদিন না শ্রেণী-হীন ও রাষ্ট্রহীন সমাজের স্বপ্নরাজ্য গড়ে উঠছে ততদিন এই নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক সঞ্চয়ের মালিক হবে নতুন শাসকশ্রেণী—সর্বহারা শ্রেণী। অর্থাৎ পুরাতন শাসক শ্রেণী যা গায়ের জোরে ভোগ করছিল, নতুন শাসক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে গায়ের জোরেই তা কেড়ে নেবে। অতএব মার্কসবাদের নৈতিক দাবী আর রইল না—তার পরিবর্তে রইল জোর-যার-মুলুক-তার নীতির গায়ের জোরের দাবী।

এ যাবৎ যে অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল তাতে এই ভুল-বিপ্লবের দর্শনকে বাধ্য হয়েই পরিত্যাগ করতে হচ্ছে। রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থাতেও বাড়তিমূল্য উৎপাদিত হচ্ছে। তা না হলে রুশিয়ার বহুল প্রচারিত ও প্রশংসিত দ্রুত শিল্পোন্নতির কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মূলধন সঞ্চয়ই হল দ্রুত শিল্পায়নের একমাত্র কারণ।

সেটা সম্ভব হতে পারে যদি প্রচুর পরিমানে বাড়তি-মূল্য উৎপাদন করা যায়—অর্থাৎ লাভ করা যায়, বা উৎপাদনকারীরা যা উৎপাদন করে তার সবটাই ভোগ করে ফুরিয়ে না দেওয়া হয়। দ্রুত শিল্পায়নের অর্থ, কম সময়ের মধ্যে অধিকতর সঞ্চয় বা অধিক পরিমান বাড়তি-মূল্যের উৎপাদন। বাড়তি-মূল্যের উৎপাদনের অর্থ যদি শ্রমিকশোষণ হয়, তবে সমাজতন্ত্রেও শ্রমিকরা শোষিত; এবং এই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে, দ্রুত নতুন মূলধন সঞ্চয় করার জন্য অধিকতর বাড়তি-মূল্য উৎপাদন ক'রে রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থাতেও শ্রমিকগণকে আরো বেশী মাত্রায় শোষণ করা হয়।

এই অবস্থায় হয় ট্রট্স্কির মত বলতে হবে ঃ "বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হয়েছে ;" নয়তো এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়, সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের নামান্তর মাত্র। বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়নি, মার্কসবাদের তাত্ত্বিক নক্সা অনুসারেই এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। লেনিন মার্কসবাদের যে ভাষ্য রচনা করেন সেই ভাষ্যের সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি বিপ্লবোত্তর সমাজের বাস্তব পুনর্গঠন সুরু করেন। না,—বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়নি; লেনিন ও স্ট্যালিন, তাঁদের গোঁড়ামি-ভরা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মার্কসবাদের যে নতুন ভাষ্য রচনা করেন তারই অন্ধ অনুকরণে বিপ্লবোত্তর পুনর্গঠনের কাজ চলেছে। এইসব কারণে ও অভিজ্ঞতার দ্বারা মার্কসীয় বিপ্লব তত্ত্বের ভুল ত্রুটি ধরা পড়ায় বিপ্লবের নতুন পথের সন্ধান করতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

বাড়তি মূল্যের ভুলতত্ত্ব, বিশেষ করে তা থেকে শ্রমিক শ্রেণীর বঞ্চিত হবার ধারণার উপরই শ্রেণীসংগ্রামের গোঁড়ামিপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি রচিত হয়েছে। মার্কস ও তাঁর গোঁড়া ভক্তেরা অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদে

বিশ্বাসী। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে, ইতিহাসের সুরু থেকে কেবল শ্রেণী সংগ্রামই চলে আসছে এই সে দিন পর্যন্ত—যেদিন বিপ্লব সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যতারও সুরু হ'ল। সেইজন্য মার্কস বলেছেন, সভ্যতার ইতিহাস হ'ল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। এটা ঠিকই, সমাজ বরাবর পরস্পর বিরোধী স্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে একটা বাঁধন ছিল এবং একটা সহযোগিতাও চলে এসেছে। তাতেই সমাজের ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে সমাজকে রক্ষা করে এসেছে। নতুবা বার বার সমাজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেত এবং সমাজের ক্রমোন্নতিও সম্ভব হত না। মার্কসের কথামত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমসাময়িক ধনতান্ত্রিক সমাজও দুটি বিবদমান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে সংগ্রামের জন্য মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়নি। এই ঘটনার দ্বারাও প্রমাণ হয় শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব ভুল। অতীত ইতিহাস সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলা যায়, একটু কল্পনার মারপ্যাচের সাহায্যে অতীত ঘটনাবলীকে যে কোন তাত্ত্বিক ছকের মধ্যে ফেলা যেতে পারে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসবাদের সিদ্ধান্ত যে ভুল তাতে কোন সন্দেহ নাই। কালক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোপ পাবে, মার্কসের এই ভবিষ্যবাণী ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। বরং প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর যে সংকট দেখা দেয় তাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক প্রভাব চূড়ান্ত বলে প্রমাণিত হয়। উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হবার ফলে সেইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য শিক্ষিত উচ্চ মাহিনার কর্মচারীর সংখ্যা (মধ্যবিত্ত) ক্রমেই বাড়তে থাকে। পরন্তু

ধনতান্ত্রিক শোষণের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েও এরা সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়নি। যখন তারা মজুরির পরিবর্তে শ্রম বিক্রয় করে, তখন অর্থনীতির ভাষায় তাদের হয়তো সর্বহারা শ্রেণী বলে বর্ণনা করা যেতে পারে ; কিন্তু শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক সত্তা হিসেবে ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাদের আছে। প্রকৃতপক্ষে একদিকে ধনিক ও আর একদিকে দিনমজুর, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার শত্রুরূপে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দিন দিন সংখ্যায় বেড়ে চলেছে।

বস্তুত সমাজতন্ত্র হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীব মতবাদ। ধনিক ও দিন-মজুর এই দুই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর দ্বন্দ্ব-বিরোধের বাইরে থাকার জন্য তারা অনেকটা নির্লিপ্ত এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষাও তাদের আছে ; কাজেই একমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এমন সব মানুষের উদ্ভব হওয়া সম্ভব যাঁরা দৈনন্দিন আর্থিক দেনা-পাওনার দ্বন্দ্ব-বিরোধ অতিক্রম করে মানুষের সঙ্গে মানুষের এক ন্যায়সঙ্গত সুসমঞ্জস সম্বন্ধের ভিত্তিতে স্থাপিত নতুন এক রাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা ভাবতে পারেন। ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেরই আর্থিক দিক থেকে জীবন ধারণের মান নষ্ট হয়ে গেছে, তা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থায় তাদের স্থানও খুব গৌরবের নয়। এই সব কারণে একে ধ্বংস করে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে তাদের এত আগ্রহ। অর্থ নৈতিক দিক থেকে তারা আজ নিঃস্ব। তাই তারা সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে মিলে সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত। কিন্তু সমাজতন্ত্র বলতে তারা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রকে মেনে নিতে পারে না। তাদের কল্পনা অধিকতর ন্যায়পরায়ণ এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আর্থিক দিক থেকে তাদের কষ্ট বাড়লেও

তারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে সর্বহারা শ্রেণীর পর্য্যায়ে নেমে আসতে পারে নি। সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যমানগুলি যে সমগ্র মানব সভ্যতার দান এ কথা তারা স্বীকার করে এবং এ সবের যথার্থ মূল্য-বিচারেও তারা সক্ষম। তাই অর্থ নৈতিক নির্দেশ্যবাদরূপ বৈপ্লবিক নিয়তিদেবীর বেদীমূলে এইসব মূল্যবান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বলিদেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্যই বৈপ্লবিক শক্তি আজ বহুধা বিভক্ত। গোঁড়া মার্কসবাদে অর্থনীতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যের প্রতি কমিউনিষ্টদের বীতস্পৃহা। এই সব কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কমিউনিজমের প্রতি বিমুখ করে তুলেছে। ফলে কমিউনিজমের বৌদ্ধিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। টাকা-কড়ি লাভ-লোকসানের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব সমাজ-তন্ত্রের মধ্যে যে নৈতিক প্রেরণা ছিল তা ম্লান করে দিয়েছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তিকে অস্বীকার করার ভুল লেনিন বুঝেছিলেন এবং তিনি সে ভুল সংশোধনের চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু ত মাত্র সংগঠণের ক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাহায্যে তার নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য। মার্কসবাদে সর্বহারা শ্রেণীর কৌলিন্যের আসন যেমনটি ছিল তেমনটিই রইল। তথাপি কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করার সময় লেনিন স্বীকার করেন, সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে স্বতস্ফূর্ত ভাবে গণতান্ত্রিক সমাজ চেতনার বিকাশ হতে পারে না, তাদের মধ্যে সে চেতনা সঞ্চার করবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এই তাৎপর্যপূর্ণ মতটির ওপর জোর দিতে গিয়ে লেনিন আরো বললেন, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে আপনা থেকে সমাজতন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। তাদের পক্ষে ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট হওয়াই সম্ভব। লেনিনের

এই মত থেকে ফুটে ওঠে মার্কসের দুই তত্ত্বের মধ্যে বিরোধ। এক তার অর্থ নৈতিক নির্দেশ্যবাদ, আর অপর হল, সর্বহারা শ্রেণীই নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

লেনিন তাঁর মতকে গুছিয়ে সাধারণ সূত্রাকারে রূপ দিলেন। তাঁর মতে, কেবল রুশিয়াতেই নয়, সর্বত্রই দেখা গেছে, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন স্বাধীন মতবাদ গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। তারা হয় বুর্জোয়াদের, নয়ত মধ্যবিত্ত সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের অনুসরণ করে এসেছে। লেনিনের এই মতে এটাই স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হ'ল যে, সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব সর্বহারা শ্রেণীর অভিজ্ঞতা প্রসূত নয়। এই আদর্শও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ভাব ও ভাবনা প্রসূত, এই তত্ত্বও তাদের দ্বারাই রচিত। মার্কসবাদেই আছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবাবেগ ও চিন্তাধারা তাদের নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং সমাজতন্ত্রের অগ্রদূত ও সংগঠক রূপে সর্বহারা শ্রেণীর গৌরব কীর্তন একেবারেই ভুল। এই কৃতিত্বের অধিকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অথচ মার্কসবাদে এই শ্রেণীকে কতই না কুৎসা করা হয়েছে এবং মার্কসীয় বিপ্লব পরিকল্পনায় এদের জন্য কোন স্থানই রাখা হয় নি।

লেনিন সংগঠনের বেলায় এ ভুল সংশোধন করেছিলেন, কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে তিনি ছিলেন গোঁড়া মার্কসবাদের অন্ধ সমর্থক। তিনি সর্বহারা শ্রেণীর মানসিক বিকাশের দুর্বলতার কথা বলেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্যটা ছিল, পার্টি সম্বন্ধে তার নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা। যে হেতু সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সঞ্চার করবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, সেই হেতু সর্বহারা

শ্রেণীর পার্টি গড়ে উঠবে পেশাদার বিপ্লবীদের নিয়ে, আর এই সব বিপ্লবী আসবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই। পার্টি সংগঠনের দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও, তাত্ত্বিক দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈপ্লবিক গুরুত্ব তিনি স্বীকার করে নিতে পারেন নি। শ্রমিক শ্রেণীর মানসিক ও চারিত্রিক অনুন্নত অবস্থা বিবেচনা ক'রে লেনিন তাদের চালাবার জন্যে পার্টিকে তাদের মাথার ওপর স্থাপন করেন. এবং পার্টিও দাবী করে যে তারা সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি। কিন্তু পার্টি কোন দিক দিয়েই সর্বহারা শ্রেণীর অংশ নয়। পার্টি হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর স্বনির্বাচিত নেতা, সর্বহারা শ্রেণীর কাল্পনিক সমষ্টিসত্তার অহংএরই মূর্তিমান প্রকাশ। পরবর্তী কালে কমিউনিষ্টদের এই "নেতাতত্ত্ব" ধার করেই ফ্যাসিষ্টরা ক্ষমতায় বসে। কিন্তু এই তত্ত্বের জনক ছিলেন, গোঁড়া আপোষবিরোধী মার্কসবাদী লেনিন এবং সেই "নেতাতত্ত্ব"ই আজো পৃথিবীর কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রধান অনুশাসন রূপে গণ্য হয়ে আসছে।

অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের তত্ত্ব অনুসারে সর্বহারা শ্রেণী শিক্ষা সংস্কৃতিতে সর্বাপেক্ষা পশ্চাদপদ হতে বাধ্য। শুধু মাত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর যখন তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে তখনই তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি লাভ করা সম্ভব হবে। কিন্তু মার্কসবাদের একটি তত্ত্বের এইরূপ সুস্পষ্ট তাৎপর্য থাকা সত্ত্বেও মার্কসবাদের অন্য এক তত্ত্বে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অপরিণত সর্বহারা শ্রেণীকেই সমাজকে এক উন্নততর সভ্যতার দিকে পরিচালিত করার সম্মান জনক ভূমিকা দেওয়া

* এই তত্ত্ব অনুসারে, অর্থনীতিই যখন মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি গড়ে তোলে, তখন যাদের অর্থ নাই তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিও নাই। (—অনুবাদক)।

হয়েছে। মার্কসবাদের মধ্যে স্ববিরোধিতা অতিশয় স্পষ্ট। তত্ত্বের মধ্যে এই স্ব-বিরোধিতার ফলে কমিউনিষ্টদের কাজকর্ম আজ ভুলে ভুলে ভরে গেছে। তত্ত্বের এই পরস্পর বিরোধিতার দুষ্ট চক্র থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তার নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর সম-পর্যায়ে টেনে নামিয়ে নেতৃত্ব লাভের জন্য মূল্য দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

কমিউনিষ্ট আন্দোলনে স্বাধীন চিন্তার কোন স্থান নেই। সর্বহারার পার্টি বলে কমিউনিষ্টদের বড় গর্ব ; তাই বুর্জোয়াদের নৈতিক আচারণ ও ধনতান্ত্রিক শিক্ষা সংস্কৃতি তাদের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু বুর্জোয়া শিক্ষা-সংস্কৃতি ছাড়া এ পর্যন্ত তো কোন নতুন সর্বহারা নৈতিক আচরণ বা সর্বহারা শিক্ষা-সংস্কৃতি গড়ে উঠল না। সর্বহারা সংস্কৃতি পরস্পর বিরোধী শব্দ। যে সব হারিয়েছে, যার কিছু নেই, তার সংস্কৃতিও নেই। আর সর্বহারাদের নৈতিক অনুশাসন হল, "যুদ্ধে আর প্রেমের জন্য সব কার্যই ন্যায় সঙ্গত।" যুক্তি হ'ল, শ্রমিক শ্রেণী যখন অতি কঠিন গৃহ যুদ্ধে লিপ্ত, তখন যে উপায়ে যুদ্ধ জয় সম্ভব হবে, সেটাই গ্রহণ যোগ্য নীতি হবে ; উদ্দেশ্যের ভাল-মন্দ দিয়েই, উপায়ের ভাল-মন্দের বিচার হবে। উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তবে তা লাভের জন্য উপায় মন্দ হলেও দোষ নেই, এই নীতি দিয়েই কমিউনিষ্টদের নৈতিক আচরণ নির্ধারিত হবে ; অর্থাৎ এই যুদ্ধ জয়ের জন্য যা কিছু করা হবে তা সবই নৈতিক আচরণ রূপেই গণ্য হবে। কমিউনিষ্ট পার্টির যে কোন বাঁধা-ধরা নৈতিক আচরণের নিয়ম-নীতি নেই তা তারা নিজেরাই স্বীকার করে এবং সাংস্কৃতিক মূল্যের প্রতি এঁদের বিরূপতাও সুস্পষ্ট।

আজকার পৃথিবী সমগ্র মানব সভ্যতার মূল্যবান ঐতিহ্যকে রক্ষা

করার জন্য এক সর্বগ্রাসী যুদ্ধে লিপ্ত। মানব সভ্যতার এই সব মূল্যবান ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপরেই গড়ে উঠতে পারে এক নতুন সমাজ, যেখানে থাকবে আরো বেশী স্বাধীনতা, আরো উচ্চতর সংস্কৃতি। কিন্তু মানব সভ্যতার এই সব নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যের প্রতি কমিউনিস্টদের বিরূপতা ও অস্বীকৃতির ফলে তারা এই সংগ্রামের নেতৃত্ব করার যোগ্যতা হারিয়েছে। ঘোরতর নৈতিক সংকটের আবর্তে নিমজ্জমান সভ্য জগৎ আজ এই সংকটত্রানের জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে এক নির্ভর যোগ্য নেতৃত্ব, যা আরো যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে সমস্যা সমূহের সমাধান করবে, এবং মহত্তর এক জীবন দর্শন।

সর্বহারা শ্রেণী স্বতঃপ্রণোদিত বৈপ্লবিক শক্তি নয়। নতুন সমাজের নতুন সমাজের আদর্শের প্রতি তাদের খানিকটা আকর্ষণ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে শিক্ষা সংস্কৃতিতে অনগ্রসরতার জন্য দূরদৃষ্টির পরিচয় দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গোড়ার দিকে মার্কসবাদ এই মূল তথ্যটি এড়িয়ে যায় নি। তাই এ তত্ত্বে লেখা হয়েছিল, সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রণী শ্রেণী-সচেতন অংশই বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম অনুভব করবে এবং তারাই বৈপ্লবিক পার্টি গড়ে তুলবে।

আপোষহীন শ্রেণী-সংগ্রাম তত্ত্বের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও কেবল মাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থে পরিচালিত দুটি বিবদমান শ্রেণীতে সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হবার মিথ্যা আশা মার্কস ও বিশেষতঃ লেনিনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে; ফলে লেনিনের ধারণা জন্মে, সর্বহারা শ্রেণীর তথাকথিত অগ্রণীদের পরিকল্পিত বিদ্রোহের দ্বারাই বিপ্লব সুরু হবে এবং সমাজের ওপর সর্বহারার একাধিপত্য স্থাপিত হবে। রুশিয়ার অভিজ্ঞতা

অনুসারে দেখা যায়, এই মতবাদ শুধু বিপ্লবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দেয় নি, সারা দুনিয়া জুড়ে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ব্যর্থতাও ডেকে এনেছে রুশিয়ায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ'ল তার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল সমগ্রদেশের ওপর এক পার্টি গোষ্ঠী কর্তৃক তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব, শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর শাসন ও অর্থ নৈতিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটা নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হ'ল মাত্র। রুশ বিপ্লবের আকস্মিক সাফল্যের পর যখন দেখা গেল, পৃথিবীর কোন দেশেই আর কমিউনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করতে পারল না, তখন ক্ষমতা দখলের কলা-কৌশল হিসাবেও কমিউনিজমের অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হয়ে গেল।*

মার্কসের পর, বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আধুনিক রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও দমন ক্ষমতা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। তার ফলে সংখ্যালঘু দল কর্তৃক বিদ্রোহের দ্বারা ক্ষমতা দখল করার কল্পনা অসম্ভব ও সেকেলে ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে। অন্য দিকে শ্রেণীতত্ত্ব ও সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্যের চেয়ে আকর্ষণীয় আদর্শ দেবার মত আর কিছুই কমিউনিজমের নেই। সেই জন্য সমস্ত প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক শক্তিকে একত্রিত করে একটা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতাও কমিউনিষ্টদের হচ্ছে না। তারা একটা গোঁড়া সম্প্রদায় বিশেষে পরিণত হয়েছে। এমন কি খাস সর্বহারা শ্রেণীর

*দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে যে কয়টি দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করেছে তা কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষমতায়, কৌশলে কিংবা জনপ্রিয়তার জন্য নয়; তা রুশিয়ার রেড আর্মির প্রত্যক্ষ শক্তির জোরে। চীনের ইতিহাসও অনুরূপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মিত্র শক্তির সাহায্য লাভ ব্যতিরেকে ও রুশ রেড আর্মির সঙ্গে যতদিন চীন কমিউনিষ্টদের সংযোগ স্থাপিত হয়নি, ততদিন তারা ক্ষমতায় আসতে পারেনি।

মধ্যেও শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যারা কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, তাদের আকর্ষণ করতেও কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উন্নত শ্রমজীবীরা আজও পুরাতন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সমূহের সঙ্গে যুক্ত আছে। ফলে মার্কসবাদের বৈপ্লবিক আবেদন শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এই যখন অবস্থা তখন শেষ পর্যন্ত ষ্ট্যালিন এমন কথাও বলেন যে, বেকার বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, অসংগঠিত শ্রমিকরাই সমাজের সর্বাপেক্ষা বড় বৈপ্লবিক শক্তি।

মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসরণ করে সর্বহারা শ্রেণী ঈপ্সিত বিপ্লব সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। কিংবা ইতিহাসের রহস্যময়ী শক্তি তাঁর প্রলয়ঙ্করী রূপে এসে জগৎজুড়ে সর্বহারার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠাও করে দেন নি। কিন্তু বিপ্লব অর্থাৎ সমাজের আমূল পুনর্গঠনের প্রয়োজন আজও ঠিক তেমনি আছে এবং ক্রমেই সে প্রয়োজন আরো বেশী লোক সর্বহারা শ্রেণী অপেক্ষা সজ্ঞানে ও তীব্র ভাবে অনুভব করছে। মানব সভ্যতার মূল্যবান ঐতিহ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রেরণার এই তীব্রতা। এটা খুবই স্বাভাবিক, সভ্যতার অবদান সমূহের মূল্য যাদের কাছে বেশী তাদের প্রেরণাই তীব্রতম। কিন্তু সভ্য সমাজকে পথ দেখাবার জন্য এ যুগের উপযোগী এক নতুন বৈপ্লবিক দর্শনের আবির্ভাব এখনও ঘটল না।

এই নতুন দর্শনের প্রধান কর্তব্য হবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রতি যারা বীতশ্রদ্ধ, তাদের নিকট এক নতুন সমাজের ছবি তুলে ধরে অনুপ্রাণিত করে তোলা, প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার ওপর এখনও যেটুকু নৈতিক সমর্থন আছে তা ধ্বংস করা এবং বর্তমান সময়ের উপযোগী

বিপ্লব সংঘটনের জন্য নতুন পথ ও উপায়ের সন্ধান দেওয়া। দেশ ও অবস্থা ভেদে সমাজ বিবর্তনের রূপ অবশ্যই ভিন্নতর হবে কিন্তু মুক্তি সংগ্রামকে সফল করতে হলে তাকে সংকীর্ণ শ্রেণী-চরিত্র পরিহার করে উদার মানবতাবাদ ও বিশ্ব প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে।

এর আরো একটি দায়িত্ব হবে, জনগণকে গণতান্ত্রিক সংস্থা সমূহের মধ্যে এনে সংগঠিত করে তোলা। এই গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি হবে বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রের ভিত্তি।

বুর্জোয়া বনাম প্রোলিতারিয়েত, ধনী বনাম শ্রমিক আজ আর প্রধান সমস্যা নয়—অবশ্য কখনও তা ছিল না, যদিও অন্যান্য সমস্যার মত এ সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা আগের মতই আছে। এই যুগের লড়াই চলেছে সর্বাত্মক একনায়কত্বের সঙ্গে গণতন্ত্রের, সর্বগ্রাসী সমষ্টিসত্তার সঙ্গে (জাতি বা শ্রেণীর) মুক্তি পিয়াসী ব্যক্তির। এ যুগে ধনতন্ত্রকে বজায় রাখতে গেলে লিবারেলিজমের উদারনীতি ত্যাগ করে ফ্যাসিজম গ্রহণ করতে হবে এবং তা হয়তো এখনো ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার দ্বারা গ্রহণ করা হবে না কিন্তু কার্যতঃ সেটাই ঘটবে।

অন্যদিকে কমিউনিজম কার্যতঃ এক সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে; জীবন যাত্রার প্রতিটি স্তর সেখানে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই অবস্থায় দুই প্রতিপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সংগ্রামকে বাইবেলের ডেভিড্ ও গলিয়াথের লড়াইয়ের মত দুই অসম শক্তির মধ্যে যুদ্ধের মত মনে হচ্ছে। কিন্তু মানুষ পুনরায় তারই সৃষ্ট দানব ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনকে বিনষ্ট করবে, বিশালকায় জন্তু লেভিয়াথানকে বশীভূত করবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একটি নতুন রাজনৈতিক দর্শন

বর্তমানে সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন : রাজনীতিকে কী যুক্তি ভিত্তিক করা যায়? এই বহু বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তরে শুধু "হাঁ" বললেই সমস্যার সমাধান হবে না, যদি না আমরা লোকায়ত যুক্তিবাদের সঙ্গে অধিবিদ্যার যুক্তিবাদের (metaphysical concept of reason) পার্থক্য টানতে পারি।* কিংবা মার্কসীয় জড়বাদী-নিয়তিবাদের পরিবর্তে যুক্তিবাদকে অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যঘন পর্যায়ে তুলে ধরে তার মধ্যে আত্মসমর্পন করলেও বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না।

এর আনুষঙ্গিক প্রশ্নটি হল, রাজনীতির সঙ্গে নীতি তত্ত্বের সম্পর্ক সংক্রান্ত : বৈপ্লবিক রাজনীতি কী "উদ্দেশ্য দিয়েই উপায়ের বিচার— the end justifies the means" এই জেস্যুইট নীতির দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকবে? যখন বিপ্লবের সবচেয়ে বড় প্রেরণা হ'ল

*এই জগৎ ঈশ্বরের আকস্মিক ইচ্ছার ফলে উৎপন্ন এবং এক মহান উদ্দেশ্যের প্রতি এই সৃষ্টি পরিচালিত হচ্ছে, সুতরাং জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই ইত্যাদি বিশ্বাসকে অনুমান স্বরূপ গ্রহণ করে, অবরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে পদ্ধতি তাকেই অধিবিদ্যার যুক্তি বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনুমানকে হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করে আরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে নিয়ম তাকেই লোকায়ত যুক্তিবাদ বলা হয়েছে। —(অনুবাদক)

নৈতিক প্রেরণা, যখন সমাজের অন্যায়-অত্যাচার দূরীভূত করে ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকে বিপ্লবের প্রেরণা তখন এ প্রশ্নের উত্তর না-ই হবে। বিপ্লবের উদ্দেশ্য যখন ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠা, তখন তা জেস্যুইট্ নীতি অনুসারে অন্যায়ের পথে আনা চলে না। কোন নৈতিক উদ্দেশ্য দুর্নীতির পথে লাভ করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কোন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে যখন কোন বৃহত্তর প্রশ্ন জড়িত থাকে এবং গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা বিদ্যমান তখন এই মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আচরণগত শৈথিল্য হয়তো কিছুটা বরদাস্ত করা যায়; কিন্তু নৈতিক আদর্শ ও সনাতন মানবিক মূল্যমান-বিরোধী কাজকর্ম যদি বিপ্লবের স্থায়ী লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায় তবে বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এই কারণেই কমিউনিষ্ট রাজনীতি বিশ্ববাসীকে, এমন কি সর্বহারা শ্রেণীকেও সামাজিক ন্যায়-নীতি ও স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজ ব্যবস্থার ধারেও নিয়ে যেতে পারেনিতো বটেই, অধিকন্তু সর্বহারা ও অসর্বহারা নির্বিশেষে সমগ্র বিপ্লবী বাহিনীকেই চিন্তার বিভ্রান্তি, মানসিক বিশৃঙ্খলা, ব্যর্থ মনোভাব ও নৈতিক অধঃপতনের মধ্যে টেনে এনেছে।

এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হলে, নতুন সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য যারা সংগ্রাম করেছে তাদের মানবতাবাদী ও নীতিবাদী র‍্যাডিক্যালদের* ঐতিহ্যের অনুসরণ করতে হবে। নতুন বৈপ্লবিক

---

*দার্শনিক প্রবর হেগেলের শিষ্যদের মধ্যে ফিউরব্যাক ও তাঁর সহযোগী ও শিষ্যদের উনবিংশ শতাব্দীর ফিলজফিক্যাল র‍্যাডিক্যাল বলা হয়। ফিউরব্যাক গুরু হেগেলের যুক্তিবাদটি গ্রহণ করেন এবং তাঁর Absolute এর ধারণাকে

দর্শনের প্রেরণা এই সব উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর র‍্যাডিক্যালরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মানবতাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুক্তিবাদ ও নীতিতত্ত্বকে লৌকিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করা যে সম্ভব তা বুঝে ছিলেন; এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম ও পদ্ধতির সাহায্যেও তাঁরা মানুষ ও সমাজকে বিচার বিশ্লেষণ করতে সুরু করেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। ইতিমধ্যে জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বিগত একশবছরেরমধ্যে এত বেড়েছে যে, ব্যক্তি মানুষের জীবন ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যাকে একেবারে মূল থেকে বিচারের র‍্যাডিক্যাল প্রচেষ্টা পূর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হতে বাধ্য। আজ এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা সুরু করতে পারি যে, বহু যুগ পূর্বেই মানুষ "প্রাগৈতিহাসিক"* যুগের আরণ্য জীবন ছাড়িয়ে চলে এসেছে এবং যুক্তিসম্মতভাবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। সেই জন্য মনুষ্য সমাজের ভারসামা বজায় রাখতে গেলে সর্বজনগ্রাহ্য এক নৈতিক অনুশাসন যে অপরিহার্য, এই তত্ত্বের সম্যক তাৎপর্য বুঝে বর্তমানের

অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করেন। পরিবর্তে বলেন, মানুষের চিন্তা ভাবনাই এই Absolute রচনা করে। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী দার্শনিকদের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যুক্তিবাদ ও নীতিতত্ত্বকে লৌকিক ভিত্তির ওপর স্থাপনের চেষ্টা করেন; কিন্তু তা অসমাপ্ত থেকে যায়। বিশেষতঃ ফিউরব্যাকের "ব্যক্তি" তখনো একটা কাল্পনিক সত্তার বাইরে বেরিয়ে বাস্তব ব্যক্তিমানুষের মধ্যে এসে রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। বিজ্ঞানের অনুন্নতিই ছিল এর প্রধান কারণ। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে ১৯৪৬ সালে মানবেন্দ্রনাথ সেই অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করলেন। —(অনুবাদক)

* মার্কস তাঁর কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টোতে লিখেছিলেন যে মানুষ এখনো "প্রাগৈতিহাসিক" যুগেই আছে। —(অনুবাদক)

দুর্নীতিপূর্ণ, ক্ষতিকর সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে নৈতিক মূল্যমানের ওপর স্থাপিত এক নতুন গণতান্ত্রিক স্বাধীন সমাজ স্থাপনের প্রচেষ্টা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। সমাজ যদি যুক্তি সম্মত ভাবে পুনর্গঠিত করা যায়* তখন সে সমাজ নীতিসম্মত সমাজই হবে; কারণ নিয়ম নিয়ন্ত্রিত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড থেকে উদ্ভূত মানুষ কার্য্য-কারণ নিয়ম অনুসারে যুক্তিসম্মত চিন্তা করে।

[মানুষ ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে অর্থাৎ ষড়রিপু তাড়িত হয়ে যখন কাজ না করে, ভেবে চিন্তে কাজ করে, তখন সে কার্য-কারণ নিয়ম অনুসারেই চিন্তা করে, সেইজন্য মানুষকে প্রধানতঃ যুক্তিপরায়ণ জীবই বলা হয়. এবং ভেবে চিন্তে কাজ করলে মানুষ দুর্নীতি মূলক কাজও করে না;] সেইজন্যই বলা হয়, মানুষ যখন প্রধানতঃ যুক্তি পরায়ণ তখন নীতি পরায়ণও বটে+; এবং নীতি তত্ত্বের উদ্ভব এই যুক্তি পরায়ণতা থেকেই।

মানুষ হঠাৎ একদিন আকাশ থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে নি। পৃথিবীর বুকেই জীব-জগতের নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে

*যে সমাজে কেহ শোষিত হবে না, সবল দুর্বলকে হটিয়ে এগিয়ে যাবে না বরং, দুর্বলকে এগিয়ে দেবে, হাত ধরে নিয়ে যাবে, 'জোর যার মুলুক তার নীতির পরিবর্তে প্রেম-প্রীতি ন্যায়-নীতি শাসিত সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠবে। —(অনুবাদক)

+ যুক্তিপরায়ণ বুদ্ধিমান জীব মানুষ যখন নিজ স্বার্থে পরিবার পরিজনের সুখ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য একা একা না থেকে সমাজ গড়ে বাস করতে চায় তখন সেই সমাজে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সামঞ্জস্যের সঙ্গে বাস করতে হলে যে এক সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসনের প্রয়োজন হয় তা তাদের যুক্তিপরায়ণতা থেকেই বুঝতে পারে। —(অনুবাদক)

মানুষের উদ্ভব। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মানুষের জীবন-রজ্জু বন্ধন কোন দিনই ছিন্ন হয় নি। মানুষ তার মন বুদ্ধি ইচ্ছা প্রভৃতি সব কিছু নিয়ে বাস্তব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং মানুষের অস্তিত্ব ও পরিণতি, তার আবেগ ও ইচ্ছা, ভাব ও ভাবনা সব কিছুই ঐ একই নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। মানুষ প্রধানতঃ যুক্তিবাদী। যে নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে ঐক্যতান রক্ষা করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলেছে, মানুষের যুক্তিও সেই একই নিয়মের সঙ্গে অনুরূপ ভাবেই ঐক্যতান রক্ষা করে চলেছে। সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সদ্‌ব্যবহার ও সহযোগিতার জন্য মর‍্যালিটি নামক যে সিমেণ্টের আবিষ্কার সে করেছে তা যে মানুষের এই যুক্তিপরায়ণতা থেকেই সম্ভব হয়েছে তা স্বীকার করতেই হয়। এই যুক্তিপরায়ণতার সাহায্যে মানুষ যখন বুঝবে যে সর্বজনগ্রাহ্য এক নৈতিক অনুশাসন মেনে না চললে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের ফলে সমাজ ভেঙ্গে যাবে এবং ব্যক্তির ও পরিবারের দুঃখ বাড়বে তখনই মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় নীতিপরায়ণ হবে—সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসনগুলি মেনে চলবে। এই যুক্তিপরায়ণতাই হল নীতিপরায়ণ হবার একমাত্র প্রেরণা। মানুষের ভাল মন্দ বিচারকারী যে বিবেকবুদ্ধি, নীতিপরায়ণ হবার আবেদন সেই বিবেকবুদ্ধির কাছেই। আর বিবেকবুদ্ধি হ'ল মানুষের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা, অর্থাৎ মানুষের কিসে ভাল হয়, আর কিসে মন্দ হয় সে সম্বন্ধে সচেতনতা ও সেই মত প্রতিক্রিয়া বা ব্যবস্থা গ্রহণ।* শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিবেকের মধ্যে অতীন্দ্রিয়, ঐশ্বরিক বা রহস্যময় কিছু নেই। বিবেকবুদ্ধি হ'ল মানুষের

* ত্রয়োদশ সূত্র দ্রষ্টব্য (অনুবাদক)।

একটা শারীরিক ক্রিয়া বিশেষ, অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র। সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন শাসিত সমাজই সুসামঞ্জস্য পূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক বিশিষ্ট সমাজ। এইরূপ সমাজ রক্ষার একমাত্র নিশ্চয়তা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তি, কারণ নীতিপরায়ণতা যুক্তিপরায়ণতা থেকেই সম্ভব হয়। সুতরাং নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হলে, মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তিশীলতা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলাই হবে একমাত্র কাজ।

সমাজ পুনর্গঠন প্রচেষ্টা সুরু করতে হবে সমাজের যে একক সেই ব্যক্তি থেকে, অর্থাৎ মূল থেকে। সমগ্র মানব সভ্যতার সকল মূল্যবান ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপর বিপ্লবের যে নতুন দর্শন রচিত হবে এবং এই দর্শন অনুযায়ী যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের তত্ত্ব ও তা প্রয়োগ ব্যবস্থার কর্মসূচী ও পদ্ধতি রচিত হবে, তাকে মৌলিকতাবাদ বা র‍্যাডিক্যালিজম বলা যেতে পারবে।

এই মৌলিক চিন্তাধারাতে জাতি বা শ্রেণী সমষ্টিসত্তার কোন স্থান নেই, কারণ এর দৃষ্টিকে জুড়ে আছে কেবল ব্যক্তি মানুষ। এই মতবাদে স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির স্বাধীনতাকেই বোঝায়। সুতরাং একে নব-মানবতাবাদও বলা যেতে পারে। "নব" বিশেষণটি দেওয়ার অর্থ এই যে, মানবতাবাদকে আধুনিক সভ্যতার কয়েক শতাব্দী ব্যাপী সমাজ আবর্তন-বিবর্তনের অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত করা হয়েছে।

মানবতাবাদ বিশ্বজনীন। আন্তর্জাতিকতাবাদের পরস্পর বিরোধী কাল্পনিক আদর্শ লাভ এর লক্ষ্য নয়। আন্তর্জাতিক অর্থে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রাক্ অস্তিত্ব ও তাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়।

জাতীয় রাষ্ট্রই যদি চলতে থাকে তবে "এক দুনিয়া" বা "এক বিশ্ব-রাষ্ট্রের" আদর্শ পরস্পর বিরোধী, তা সোনার-পাথর-বাটির মত কাল্পনিক আদর্শই থেকে যায়। মুক্তমনা নরনারীর সমবায়ে এক বিশ্ব-রাষ্ট্র গড়ে তোলা আজ আর অসম্ভব নয়। এই বিশ্ব রাষ্ট্রের নাগরিক মানব-গোষ্ঠী এক আত্মিক বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকবে। কোন ধনতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ত, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র বা অন্য কোন প্রকার জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানাই এই সব বিশ্ব-নাগরিককে ধরে রাখবে না। এই বিশ্বজনীন মানবতাবাদের অভ্যুদয়ের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এই সব জাতীয় রাষ্ট্র সমূহ বিলুপ্ত হয়ে আসবে রাাডিক্যালদেব দৃষ্টিতে এই হচ্ছে মানব জাতির ভবিষ্যৎ আদর্শ

* দ্বাবিংশ সূত্র দ্রষ্টব্য (অনুবাদক)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাসি
(আমূল গণতন্ত্র বা মানবতন্ত্র)

এ যুগের মানুষকে যে-দর্শন নতুন আশা ও নতুন বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে সেই দর্শনকে অবশ্যই মুক্তির অর্থ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে হবে; মুক্তিলাভ করলে, মানুষের দাবীর কতটা কী পূরণ হবে তা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে। সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ব্যক্তি মানুষকে, তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তুলতে কতখানি সাহায্য দেবে তার বিচার যদি বর্তমানের নানা পরস্পর বিরোধী মতবাদের গোঁড়ামি ও অন্ধ সংস্কার ও অনুশাসন দিয়ে করতে হয় তা হলে কেবল বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করবে এবং ইতিহাসের বৃহত্তম এই সংকট থেকে মানুষকে উদ্ধার করে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাও সম্ভব হবে না এবং সংকট ত্রাণের আদর্শ আকাশ কুসুমের মতই অলীক থেকে যাবে। সর্বজনকাম্য এক মুক্তির আদর্শের জন্যই এক সার্বজনীন প্রচেষ্টা সম্ভব হতে পারে।

মানুষের মুক্তি আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়েছে তার জীবন সংগ্রাম থেকে।* এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষাই তাকে জীবন ধারণের প্রয়োজন মেটবার পরও

* দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্র দ্রষ্টব্য (অনুবাদক)।

প্রকৃতির ওপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করেই চলেছে মানুষের নব নব জ্ঞানান্বেষণ প্রচেষ্টা। এর ফলেই সে প্রাকৃতিক ঘটনা, ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের অত্যাচার ও শাসন থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি পেতে পেতে এগিয়ে চলেছে। মানুষ তার জীবন সংগ্রাম চালাতে চালাতে যখন বিবর্তনের উন্নত স্তরে উঠেছে তখন সেই সংগ্রাম ক্রমে বুদ্ধি ও সুকুমার আবেগের স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং সেটাই তখন উচ্চ মূল্যমানের পর্যায়ে এসে মানুষের এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় রূপ নিয়েছে। আধুনিক সমাজে ব্যক্তি মানুষকে যদি মুক্ত জীবনযাপন করতে হয় তবে তার শুধু অর্থ নৈতিক প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা থাকলেই চলবে না, তার অন্তর্নিহিত সকল বৃত্তি ও শক্তি সমূহের বিকাশ সাধনের অনুকূল এক মানসিক পরিবেশ ও এক মুক্ত আবহাওয়ার প্রয়োজন হবে, যেখানে কোন প্রকার বাঁধাধরা মতবাদের অন্ধ অনুশাসন থাকবে না। সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ এই প্রকারের ব্যাপক অর্থে স্বাধীনতা ও মুক্ত পরিবেশ কতটা অর্জন করেছে তাই দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের গুণাগুণ বিচার হবে। "মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি" এই প্রাচীন ঋষি বাক্য অনুসরণ করে ভবিষ্যতের দর্শনকে ঘোষণা করতে হবে, ব্যক্তি মানুষ কতখানি স্বাধীনতা পেল কিংবা পেল না, সেই মাপকাঠি দিয়েই কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের গুণাগুণ বিচার হবে।

জাতিই হোক আর শ্রেণীই হোক সব রকম সমষ্টি সত্তাই গড়ে ওঠে ব্যষ্টিরূপ ব্যক্তিকে নিয়ে।* মানুষ+ আরো অধিক মাত্রায় নিজ সুখ-

*প্রথম সূত্র দ্রষ্টব্য (অনুবাদক)।

+ এখানে মানবেন্দ্রনাথ আদিম মানবকে "Man" এক বচনে ব্যবহার

স্বাচ্ছন্দ্য ও এ সবের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার জন্যই সমাজবদ্ধ হয়েছিল সমাজ গড়েছিল। আদিম যুগে পারিবারিক মানুষ তার পারিবারিক জীবন সংগ্রামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য নিয়েই অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সমাজ সম্পর্কের প্রবর্তন করে ; এবং আদিম মানুষের এই সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা সে ব্যক্তি মানুষ হিসাবেই সুরু করে। এই যে মানুষের জীবন সংগ্রামের বাধাবিপত্তি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তা কেবল তার জীবন সংগ্রামের কষ্ট লাঘবের ইচ্ছা থেকেই উদ্ভূত। কাজেই দেখা যাচ্ছে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে মানব সমাজের গতি প্রগতির মূল প্রেরণা। মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তিশীলতা, নীতিবোধ ও অন্যান্য সৃজনশীল সম্ভাবনাগুলি বিকাশের পথে যে সব প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাধা আছে তার ক্রমঃ

করেছেন, কিন্তু তার অর্থ নয় যে আদিম মানব সমাজবদ্ধ হবার পূর্বে একা একাই থাকত। মানুষ কোনদিনই তা থাকত না। মানুষ প্রথম থেকেই পারিবারিক। কারণ মানুষের জননীকে জীবিকার্জনের কষ্টকর দায়িত্ব থেকে অবসর দিতে হয় এবং মানব শিশুকে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত মাতার ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, সেইজন্য মানুষ প্রথম থেকেই পারিবারিক।

প্রাণী জগতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যে-সব জীব একা একাই থাকে, কেবল বংশ রক্ষার সময় স্ত্রী পুরুষ ক্ষণিকের জন্য মিলিত হয়, স্ত্রী-প্রাণী সুবিধামত স্থানে ডিম পেড়েই ছুটি নেয়—সন্তান পালনের দায়িত্ব থাকে না, আপনিই ডিম ফোটে—বাচ্চারা নিজেরাই প্রকৃতি থেকে খাদ্য আহরণ করে বেঁচে থাকে ; যেমন কীট পতঙ্গ জাতীয় প্রাণী। যে সব প্রাণী দল বেঁধে থাকে ; যেমন পিঁপড়ে, মৌমাছি, উইপোকা।

যে সব প্রাণী পারিবারিক, স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে পরিবার বেঁধে বাস করে যেমন—সিম্পাঞ্জি, ওরাং, গিবন ও মানুষ। মানুষ স্বভাবতঃ পারিবারিক জীব সেইহেতু সে পিঁপড়ে মৌমাছির মত সামাজিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন জীব নয়। তার আঁতের টান নিজ নিজ স্ত্রী ও সন্তানের ওপর—প্রতিবেশীর প্রতি নয়। কিন্

অপসরণই হচ্ছে মুক্তি। সমাজের নানা আইন কানুন ও বিধি নিষেধের দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্যক্তি মানুষের জন্য সর্বাধিক স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা করা। সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে তার সমষ্টি দিয়েই যে কোন সমাজ ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও প্রগতিমূলক মূল্যের বিচার করতে হবে। নতুবা সামাজিক অন্যায় অবিচার থেকে মুক্তি ও উন্নতির আদর্শ মিথ্যা হয়েই থাকবে।

কোন রাজনৈতিক দর্শন বা সামাজিক পুনর্গঠন পরিকল্পনায় ব্যক্তির স্বাধীনতার আদর্শ যদি শূন্যগর্ভ অবাস্তব ও কাল্পনিক বলে পরিত্যক্ত হয় তবে তার বৈপ্লবিক গুরুত্ব খুবই কম না হয়ে পারে না। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় (রাষ্ট্রে) ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় রক্ত-মাংসের ব্যক্তি মানুষকে কাল্পনিক সমষ্টি সত্তার যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়, সম্ভবতঃ তা দিয়ে ব্যক্তি মানুষের মুক্তি অর্জন করা যায় না। স্বাধীনতা কেড়ে নিলে অর্থাৎ একনায়কত্ব স্থাপন করলে মানুষ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলবে, এ কথা বলা অর্থহীন। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক

*তৃতীয় সূত্র দ্রষ্টব্য (অনুবাদক)।

যেহেতু মানুষ যুক্তিপরায়ণ জীবও বটে, সেইহেতু সে নিজ নিজ যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে নিজের এবং নিজ পরিবার পরিজনের জীবন সংগ্রামের কষ্ট লাঘবের জন্যই সমাজবদ্ধ হয়েছে এবং প্রতিবেশীর ওপর কোন স্বাভাবিক আঁতের টান না থাকার জন্য সদব্যবহার না করলে সমাজবদ্ধতা থাকবে না সেইজন্য পরস্পরের বাঁধনের সিমেণ্ট স্বরূপ সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন প্রবর্তন করেছে, দণ্ডবিধি রচনা ক'রে সমাজে ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। "মানুষ"কে একবচনে ব্যবহার করলে পাছে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে সেইজন্য আমি Man এর স্থানে "পারিবারিক মানুষ" লিখেছি (অনুবাদক)।

সকল প্রচেষ্টার যুক্তিসম্মত লক্ষ্য হওয়া উচিত অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় ব্যক্তির স্বাধীনতা লাভ। একমাত্র ব্যক্তির স্বাধীনতা রূপেই স্বাধীনতা বা মুক্তির আদর্শ বাস্তব হয়ে উঠতে পারে।*

কেবলমাত্র অর্থনীতির পুনর্গঠন করলেই কোন সমাজ আপনা থেকেই মুক্ত সমাজ হয়ে ওঠে না; অথবা শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দাবীদার কোন রাজনৈতিক পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলেই যে সকল ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোপ, উৎপাদনের উপায় সমূহের ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যেই শ্রমিক শোষণের অবসান বা ধনের সমবণ্টন হয় না। যন্ত্র-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ সুযোগ নেওয়ার অজুহাতে কখনও বা কর্ম কুশলতা বাড়াবার জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দোহাই দিয়ে ব্যক্তির ভাল-মন্দকে অস্বীকার করা হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যে ব্যক্তির উন্নতি সেটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। এই জোর করে ওপর থেকে চাপানো. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা সামাজিক ন্যায়নীতি ও অর্থনৈতিক সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত উন্নততর গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কশাসিত রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়! অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলেও হতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা একেবারেই সম্ভব নয়।† অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর যাঁরা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, এটা তাঁদের স্মরণ রাখা দরকার।

* অষ্টম সূত্র দ্রষ্টব্য (অনুবাদক)।

† দশম ও একাদশ সূত্র দ্রষ্টব্য (অনুবাদক)।

সর্বপ্রধান প্রশ্ন হল: কী জন্য পরিকল্পনা? ধরে নেওয়া হয়, পরিকল্পিত অর্থনীতির দ্বারা সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হবে। অন্য কথায়, এর দ্বারা ধনের সমবণ্টনের সাহায্যে সমাজে ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠা হবে। তা যদি হয় তা হলে অবশ্য ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে পরিকল্পনার সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে। আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞান যে স্তরে এসে পৌঁছেছে তাতে ব্যক্তি স্বাধীনতার সম্যক স্ফূর্তির পক্ষে যদি তা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে মানুষের কল্যাণের জন্য যন্ত্র-বিজ্ঞানের অধিক উন্নতি খর্ব করতে হবে। ডাঃ ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন সৃষ্ট রাক্ষস যেমন তার স্রষ্টাকেই হত্যা করেছিল, তেমন যন্ত্র যেন তার স্রষ্টা বর্তমান সভ্যতাকেই ধ্বংস না করে সেটা দেখতে হবে। যন্ত্র যখন মানুষই সৃষ্টি করেছে তখন সে মানুষেরই সেবা করবে—মানুষের মুক্তি লাভে, মনুষ্যত্বের বিকাশে সাহায্য করবে।*

একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অজুহাত যেমনই কেন হোক না, সমাজ উন্নয়ণের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট পরিকল্পনায় তার স্থান নেই। রাজনীতি থেকে যদি ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দেওয়া হয় তবে রাজনীতির

*যন্ত্র ইতিমধ্যে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করতে সুরু করেছে। তারপর যন্ত্রের মালিকানা ব্যক্তির হাতে থাকায় এবং তা লাভ খাওয়ার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হওয়ায় ক্রমেই মানুষকে পুতুল-নাচের পুতুলে পরিণত করা হচ্ছে। আমেরিকার বর্তমান সমাজ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এবং পৃথিবী ব্যাপী তারই অনুকরণ চলছে। মানবেন্দ্রনাথ এখানে সেই বিপদের কথাই স্মরণ করিয়ে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করছেন বর্তমান নগরকে ও যন্ত্রশিল্পকে গ্রামঅঞ্চলেও বিকেন্দ্রিত ক'রে যন্ত্র মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে যে পর্যন্ত সহায়ক হবে সে পর্যন্ত তা গ্রহণ-যোগ্য হবে, কিন্তু যখনই তা মনুষ্যত্বের পক্ষে হানিকর হয়ে উঠতে থাকবে তখনই সেখানে সীমারেখা টানতে হবে। আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমবায়মূলক অর্থনীতির দ্বারা সেটা সম্ভব হবে। (অনুবাদক)

উদ্দেশ্য যে সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এটা অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য যে, নীতিবিরুদ্ধ অসৎ উপায়ের দ্বার সৎ উদ্দেশ্যে পৌছান যায় না, অসৎ উপায়ই সম্প্রসারিত হয়ে চলতে থাকে। এই সত্য অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়ানে মানুষের মুক্তি আনার উপায় স্বরূপ সর্বহারার একাধিপত্যই চিরস্থায়ী ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। এই সর্বহারার একাধিপত্যই কমিউনিজমের সঙ্গে সমার্থব হয়েছে—উপায়ই লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের (মার্কসবাদ অনুসারে) বিলুপ্ত হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।* সোভিয়েট ইউনিয়ানে যদি বাস্তবিকই সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে তবে এই পরিবর্তনের জন্য যে মধ্যবর্তীকালের প্রয়োজন ছিল তার নিশ্চয় অবসান ঘটেছে। এবং এতদিনে একাধিপত্যের শেষ হওয়াও উচিত ছিল। যতদিন না রুশিয়াতে একাধিপত্য শাসনের অবসান হচ্ছে এবং অন্যান্য দল ও মতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে, ততদিন সেখানে উচ্চ পর্যায়ের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলাও অর্থহীন

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের কাজ কর্মও তেমনি নৈরাশ্যজনক। সেই জন্য গতানুগতিক "গণতান্ত্রিক-সমাজতন্ত্রের" সাফল্য সম্পর্কেও ভরসা করা যায় না। গণতন্ত্রকে নব-রূপ গ্রহণ করতে হবে। গণতন্ত্রকে মানবতাবাদী ঐতিহ্যে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানের মত গণতন্ত্রকে কেবল মাথাগুণতির হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ-লঘিষ্ঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বিশেষতঃ মানুষ যখন তাদের সার্বভৌম রাজক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য উপযুক্ত মর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার

*অষ্টম ও নবম সূত্র দ্রষ্টব্য (অনুবাদক)

কোন সুযোগ পায় না। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দ্বারা বর্তমানের প্রতিনিধি মারফৎ পরোক্ষ শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তিত করতে হবে। রাজনৈতিক পার্টির চরিত্র বিচার করতে হবে তার ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী দিয়ে—ভোট ধরবার ক্ষমতা দিয়ে নয়। শুধু মাত্র মুখের কথা বা প্রতিজ্ঞার দ্বারা জনগণের নিকট ভোট ভিক্ষা করলে চলবে না, সেই পার্টির রাষ্ট্র শাসনের পূর্বতন নজির দেখিয়েই তা করতে হবে। এই গণতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যাপারে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশের বা মতামত জানাবার কোন ব্যবস্থা নেই, আছে কেবল ব্যালট বাক্সে মাথা গুণতির ব্যবস্থা। বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে, ব্যক্তি সত্তার পরিবর্তে এও সমষ্টিসত্তার নিকট আত্মসমর্পণ। এই ব্যবস্থার ফলে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানাবার বা বুদ্ধি-বিবেচনা প্রকাশের কোন সুযোগই থাকে না।* পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রে নীতিবোধ শূন্য বাক্যবীরেরা জনগণকে তাদের বাক্যজাল বিস্তারের দ্বারা অভিভূত ক'রে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসতে পারে। প্রজ্ঞা, সততা, জ্ঞান, নীতি ইত্যাদির কোন মূল্যই সেখানে থাকে না। অথচ মানব সভ্যতার এই সব মূল্যবান গুণাবলীর সাহায্যে সমাজের রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত শোধন করার ব্যবস্থা না করলে সমাজে গণতান্ত্রিক জীবন কোন দিনই গড়ে উঠতে পারে না।

বর্তমান জগতে মানব সভ্যতার ঐ সব মূল্যবান গুণাবলীর ধারক ও বাহক নরনারীর অভাব নেই। কিন্তু যতদিন এই অবাঞ্ছিত

---

*ফলে জনসাধারণের করার কিছু থাকে না বলে জনসাধারণের বুদ্ধি বৃত্তি অনুশীলনের অভাবে কোন দিনই বাড়তে পায় না। নেতাদের, পার্টির, ডেমাগগির দ্বারাই চালিত হতে হয়। (অনুবাদক)

বাকাবীর ডেমাগগরা ক্ষমতায় বসে থাকবে ততদিন এইসব গুণীদেব নেতৃত্ব লাভের কোন আশা নেই। এই তো গেল পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রেব দিক।

অন্যদিকে, একাধিপত্যশাসিত রাষ্ট্রও যদি একবাব জেঁকে বসে—তা সে যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের ঘোষণা করলেও—তবে সেও এইরূপ গুণ সম্পন্ন নাগরিকের উদ্ভবে বাধা দেবে। এইভাবে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসিতেই হোক আর একাধিপত্য শাসিত রাষ্ট্রেই হোক মানব সমাজ এই সব মুক্তবুদ্ধি ধীমান প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রমোন্নতির পথে মুক্তির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে পারে না।

বর্তমানের পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থার তথাকথিত গণতন্ত্রে যদি এই সকল মূল্যবান গুণ-সমুহের দ্বারা রাজনীতিকে বিশুদ্ধ ও প্রভাবিত করার সুযোগ সুবিধা না থাকে, তাহলে একাধিপত্য শাসিত রাষ্ট্র এইসব মানবিক গুণসমূহ বিকাশে বাধা দেয় বলে তার নিন্দা করা এদের মুখে সাজে না। একাধিপত্যের দ্বারা সকল দুঃখের রাতারাতি সমাধানের আপাতঃমধুর প্রলোভনের হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাতে হলে গণতন্ত্রকে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে যে মানবতাবাদী ঐতিহ্য ছিল তা পুনরাবিষ্কার করতে হবে।

পুনরায় ব্যক্তি মানুষকেই সকল উন্নতি-অবনতির মাপকাঠি করতে হবে। প্রজ্ঞা, সততা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও নীতিপরায়ণতার উৎকর্ষ দিয়েই নেতৃত্বের বিচার করতে হবে। একটা অন্তসারশূন্য আকার সর্বস্ব কাঠামোটা থাকলেই দেশে যে গণতন্ত্র আছে তা ধরে নেওয়া যাবে না। আজ প্রতিটি স্বাধীনতাকামী চিন্তাশীল ব্যক্তি এক কঠিন প্রশ্ন

মাধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন : গণতন্ত্র কী সম্ভব ? পার্লামেণ্টারি ণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করায় যাঁরা বিশ্বাসী, তারা একনায়ক-ন্ত্রকে পরিহার করেছেন বটে কিন্তু তাঁরাও আজ এই প্রশ্নটির সন্তোষ-নক উত্তর দিতে পারেন নি। গণতন্ত্রের মূলনীতি যে, সর্বাধিক লোকের বাধিক কল্যাণ সাধন, তা সম্ভব হতে পারে যখন রাষ্ট্র পরিচালনার ায়িত্ব মুক্তবুদ্ধি, বিবেকবান ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত হবে, কারণ এঁরাই নিজেদের বিবেকের নির্দেশকে সর্বাপেক্ষা বেশী মূল্য দিয়ে থাকেন।

নৈতিক প্রেরণাই মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় প্রেরণা। পার্লা-মেণ্টারি গণতন্ত্রে যে স্ব-শাসন চলবে তার নিশ্চয়তা আইন দেয় না, দেয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতিজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি। ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, একনায়কতন্ত্রও ঐ নৈতিক প্রেরণা থেকেই অনুপ্রাণিত। সেই জন্যেই তারা বলে, সমগ্র জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই একনায়কতন্ত্র উপায় মাত্র। কিন্তু ক্ষমতার লোভ থেকে উর্ধে উঠে সমগ্র দলটাই যে নীতিপরায়া থাকবে এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সৎ অসৎ মূল্যমানের প্রকাশ ব্যক্তির মাধ্যমেই ঘটে। সুতরাং একমাত্র মুক্তবুদ্ধি বিবেকবান ব্যক্তি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাতেই সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। কারণ সর্বাগ্রে তারা তাদের নিজ নিজ বিবেকের নিকট দায়ী থাকে। বর্তমান সংকট থেকে ত্রাণ পেতে গেলে ও একনায়কতন্ত্রের প্রবল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে গণতন্ত্রের এইরূপ দার্শনিক রূপায়ণই একান্ত প্রয়োজন।

যা বলা হ'ল তার অর্থ এই নয় যে, "জ্ঞানী-গুণী"দের রাজ প্রতিষ্ঠিত হোক। এখানে মাত্র বলা হল যে, সমাজকে এমন ভাবে পুনর্গঠিত

করা হোক যাতে প্রতিটি মানুষ তার অন্তর্নিহিত সৃজনশীল শক্তিকে বিকশিত করে তোলার অফুরন্ত সুযোগ পায়। এটি সম্ভব হয়ে উঠবে তখনই যখন মানুষ সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থের প্রভাব মুক্ত হবে, যখন তারা আর লোক ক্ষ্যাপানো ডেমাগগ নেতাদের জাতীয় স্বার্থ বা শ্রেণী স্বার্থের কাল্পনিক সত্তার দোহাই-পাড়া বক্তৃতায় পূর্বের মত সহজে মোহগ্রস্ত হবে না এবং এইসব মোহ-মুক্ত মানুষের হাতে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালন ক্ষমতা ন্যস্ত হবে। কয়েক বছর অন্তর একদিন ভোটপত্র প্রদান মাত্রের মধ্যেই গণতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। নির্বাচন যদি সার্বজনীন ভোটের দ্বারাও হয়, কিংবা নির্বাচিত সদস্যের মধ্য থেকেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, তথাপি গণতন্ত্র শূন্যগর্ভ আকার সর্বস্বই থেকে যায়। সার্বভৌম ক্ষমতার স্বত্ব ত্যাগ করে তা প্রতিনিধির হাতে তুলে দেওয়া, তা সে যত কম সময়ের জন্যই হোক, গণতন্ত্র বিরোধী এক বেকুবি ব্যবস্থা। এই হস্তান্তরিত সার্বভৌম ক্ষমতার স্বত্বে স্বত্ববান হয়ে, প্রতিনিধিরা যখন সরকার গঠন ক'রে বলে, জনসাধারণের "জন্য" সরকার গঠন করলাম, তখন যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলা চলে, যে-সরকার জনগণের "জন্য" (for) গঠিত হয়, সে-সরকারের "উপাদান" (of) জনগণ হতে পারে না ; এবং তা জনগণের "দ্বারাও" (by) পরিচালিত হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত স্থানীয় গণ-সভা সমূহের ওপর ভিত্তি করে যদি এক পিরামিড্ আকারের রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয় একমাত্র তখনই রাষ্ট্র পরিচালন ব্যাপারে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।*

পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র বা একাধিপত্য শাসিত রাষ্ট্রকে বলা যেতে পারে,

এইসব গণ-সভা সমূহের সর্বপ্রধান কাজ হবে জন-সাধারণকে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা এবং সুবিবেচনা ও বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী সে অধিকার ব্যবহার করতে শেখান। সমগ্র সমাজ জুড়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই যে ব্যাপক ভিত্তি সেগুলি হবে জনগণকে হাতে-কলমে রাজনীতি শিক্ষা দেবার যেন এক একটি বিদ্যাপীঠ। আইনসভা সমূহের প্রতিনিধিরা অনাস্থা ভাজন হলে তাদের ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা ও আইন-কানুন সমূহের ওপর মতামত দেবার ক্ষমতা থাকার ফলে এই সব গণ-সভাগুলি সমগ্র রাষ্ট্রের ওপরই প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন করার অধিকার থাকবে একমাত্র এদেরই। এই ব্যবস্থার দ্বারা রাজনৈতিক পার্টি সমূহের দলাদলির উর্ধে গণতন্ত্রকে স্থাপন করা হবে। গুণী মানুষ তখন নিজ গুণেই জনগণের নিকট স্বীকৃতি লাভের সুযোগ পাবে। পার্টির স্বার্থরক্ষার জন্য বা পার্টির নিকট আনুগত্যের জন্য বা তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য বা অন্য কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণ পাবার প্রত্যাশায় তখন আর কাকেও

উল্‌টো পিরামিড্। কারণ এসব রাষ্ট্রে সব ক্ষমতা ওপরে, আর তলায় একেবারে শূন্য। মানবতন্ত্রী রাষ্ট্রকে সে তুলনায় সিধা পিরামিড বলা হচ্ছে। কারণ এখানে সকল ক্ষমতা তলায়, মাথায় একেবারে শূন্য। এখানে সার্বভৌম ক্ষমতা লোক-সভায় কেন্দ্রীভূত থাকবে না, তা গ্রামে গ্রামে ও নগরের পাড়াতে পাড়াতে ছড়িয়ে থাকবে। অনধিক ১০০০ মানুষ বাস করেন এমন অঞ্চলকে নিয়ে এক একটি গণ-সভা গঠিত হবে এবং সকল পূর্ণবয়স্ক মানুষ সেই গণ-সভার সদস্য হবে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা এই সকল গণসভা সমূহের দ্বারাই ব্যবহৃত হবে। এই সকল গণ-সভা সমূহের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনের জন্য একটি কার্যকরী সমিতি (পঞ্চায়েত) থাকবে। তারা গণ-সভার দ্বারা নির্বাচিত হবে এবং এর নিকট দায়ী থাকবে।

চিন্তার স্বাধীনতা, নৈতিক নিষ্ঠা, নিরপেক্ষ জ্ঞানবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হওয়ার মত অবস্থা থাকবে না।

এই গণসভা সমূহের নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকবে : (১) লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রার্থী মনোনয়ণ। (পল্লী অঞ্চলে নির্বাচনের সময় বা অন্য কোন কারণে মত বিরোধ দেখা দিলে সে মত বিরোধ মনোমালিন্যে দাঁড়ায় এবং বহুদিন ধরে চলতে থাকে। এই বিপদ এড়াবার জন্য বহু প্রার্থীর মধ্য থেকে ক্রমশঃ ছাঁটাই পদ্ধতিতে (process of elimination এই মনোনয়ণ কার্য চলতে পারে। যথা, যিনি বা যাঁহারা শতকরা নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে কম ভোট পাবেন এবং যিনি সবচেয়ে কম ভোট পাবেন তিনি বাদ পড়বেন। তার পরে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের নিয়ে পুনরায় ভোট হবে। এই ভাবে বাদ পড়তে পড়তে মাত্র দু'জনের মধ্যে যিনি সর্বাধিক ভোট পাবেন তিনিই সেই অঞ্চলের সকল গণ-সভার মনোনীত প্রার্থী হবেন এবং সার্বজনীন ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন।)

(২) প্রতিনিধিগণ যাতে লোকসভায় ও রাজ্যবিধান সভায় জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশ করতে সক্ষম হয় সেই জন্য তাদের অনুক্ষণ সচেতন ও ওয়াকিবহাল রাখা ;

(৩) লোকসভায় ও রাজ্যবিধান সভায় আলোচ্য আইন-কানুন সম্বন্ধে আলোচনা ও সে সম্বন্ধে মতামত জ্ঞাপন ;

(৪) নির্বাচক মণ্ডলীর আদেশ অমান্যকারী প্রতিনিধিকে অপসারণ ;

(৫) লোকসভা বা বিধানসভায় আলোচনার জন্য যে কোন আইনের খসড়া রচনা ও প্রেরণ ;

(৬) লোকসভা, বিধানসভা বা শাসন পরিচালন বিভাগ কর্তৃক আর কোন কাজ সম্বন্ধে মতামত জ্ঞাপন ;

(৭) স্থানীয় জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা (মাধ্যমিক পর্যন্ত), পথ ঘাট, উৎপাদক ক্রেতা সমবায়, নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা, ছোটখাট অপরাধের বিচার প্রভৃতি।

এই সকল গণ-সভা হবে জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং সমন্বয় সাধনের জন্য এ দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ গণ-সভার ওপর থাকবে পিরামিডের চূড়ার মত লোকসভা বা পার্লামেণ্ট।

গণতন্ত্রকে সম্ভব করে তোলার জন্য যে অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধেই উপরি উক্ত কথাগুলি বলা হল। গণতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা নিজ নিজ বৃত্তি ও সম্ভাবনা সমূহকে বিকশিত ও সম্ভোগ করার জন্য ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা ; এবং সেই ইচ্ছা পূরণের পথে যে সব বাধা-বন্ধন দেখা দেবে সেই সব বাধা-বন্ধন মুক্তির জন্য মানুষকে উদগ্র করে তোলা ; এই সকল বাধা-বন্ধন মুক্ত হতে মানুষ যে নিজের চেষ্টাতেই পারে, মানুষ নিজেই যে নিজের জীবন ইচ্ছামত গড়ে তুলতে পারে এই প্রত্যয় জাগিয়ে তোলা ; সংস্কার মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তা করার জন্য মানুষের মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত করা ; এবং নিজেদের স্বাধীনতা পরের হাতে তুলে দিয়ে (পার্টি বা ডিকটেটরের হাতে) দাসত্বের নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবনের ওপর ঘৃণা জাগিয়ে তোলা। গণতন্ত্রকে যদি মানুষের জীবনে রূপায়িত করে তুলতে হয় এবং তা প্রতিরক্ষার জন্য সামর্থ্য লাভ করতে হয়, তা হলে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও বিশ্বজনীন মানবতাবাদের ওপর ভিত্তি করে এক নতুন রেনেসাঁস আন্দোলন জাগিয়ে তুলতে হবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই দু'দশখানি গ্রাম বা মহকুমা, এমন কি জেলা পর্যায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে হয়। সেইজন্য পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা তিনটি স্তরে (অঞ্চল পঞ্চায়েত, ব্লক পঞ্চায়েত, জেলা পঞ্চায়েত) এই সংগঠনটি থাকবে।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান পঞ্চায়েত-রাজ আইন মানবেন্দ্রনাথের গণ-সভার আদর্শেই রচিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা কেবলমাত্র স্বায়ত্ত শাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। এর ফলে অতি সহজেই জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করে রাষ্ট্রকে মানবতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিবর্তিত করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

(অনুবাদক)

এই রূপ পরিবেশ গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে যে স্বাধীন যুক্তিসঙ্গত চিন্তার স্ফূরণ হতে থাকবে তার ফলে মানুষের উচ্চতর গুণাবলীসমূহ সার্থকতার পথে পদক্ষেপ করবে। সভ্যতার আদিকাল থেকে মনুষ্য সমাজ যে সকল সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন অনুসরণ করে আসছে সেই সব নৈতিক অনুশাসন মেনে চললেই সমাজের সংহতি ও ভারসাম্য রক্ষিত হবে এবং মানুষও সুখ শান্তি প্রগতির পথে এগিয়ে চলতে পারবে। তখন এর জন্য আর শ্রেণী বা জাতির কল্যাণে ব্যক্তিকে আত্মত্যাগ করতে বাধ্য ক'রে সমাজের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টার প্রয়োজন হবে না। যে সকল ব্যক্তি এইরূপ নৈতিক জীবন যাপনে উৎকর্ষ লাভ করতে পারবেন তাঁরাই চিন্তাশীল মানুষের নিকট সম্মানিত হতে থাকবেন এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় রূপে গণ্য হবেন। তখন লোক ক্ষ্যাপানো ডেমাগগদের দিন ফুরিয়ে যাবে। তখন কিছুদিন অন্তর নির্বাচনের সময় এক খণ্ড কাগজ ব্যালট বাক্সে ফেলেই গণতন্ত্রের সকল অধিকার ফুরিয়ে যাবে না—রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের অধিকারও থাকবে। তখন জনগণ আর কেবল মাত্র "জনতা" মাত্রই থাকবে না—সংহত হয়ে উঠবে।

নবরূপায়িত গণতন্ত্র বাস্তবে রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে অবশ্যই দেরী হবে। কিন্তু যতদিন না গণতন্ত্রের সে রূপায়ণ হচ্ছে ততদিন সেই পরিবর্তন কালের জন্য পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রেই এমন একটি সংবিধান রচনা করতে হবে যাতে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় দেশের সৃজনশীল প্রতিভা, মুক্ত বুদ্ধি এবং নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের স্থান হয়, যার ফলে তাঁরা মন্ত্রী প্রমুখ শাসনকার্য পরিচালকবর্গকে তাঁদের পরামর্শ ও প্রভাবের সাহায্যে পথ প্রদর্শন করতে পারেন। এই পরিবর্তন কালের জন্য

পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র একদিকে যেমন জনগণের দ্বারা নির্বাচন ভিত্তিক হবে, অন্য দিকে তেমনি উচ্চ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে বেছে রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে স্থান দেবার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। যতদিন না সমগ্র সমাজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও নৈতিক মান যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়ে উঠছে ততদিন হয়তো কেবল নির্বাচনের মাধ্যমেই সমাজের গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের আইন সভা সমূহের মধ্যে আনা সম্ভব হবে না। অথচ জনসাধারণের বর্তমান অনগ্রসর অবস্থায় রাষ্ট্রের ওপর এ সব মুক্তবুদ্ধি ধীমান নীতি-নিষ্ঠ ব্যক্তির প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থা করতে না পারলে গণতন্ত্র সার্থক হয়ে উঠবে না।

এই পরিবর্তন কালের জন্য পার্লামেণ্টে যে রাজ্য সভা (Council of State) থাকবে তা গঠিত হবে বৈজ্ঞানিক, ধীমান, চরিত্রবান, জ্ঞানী ও নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে এবং এই রাজ্যসভাই মন্ত্রীবর্গকে জরুরি সব রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও শাসনকার্য পরিচালন ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে চলবে। যাঁদের নিয়ে এই রাজ্যসভা গঠিত হবে তাঁরা সাধারণতঃ দলগত রাজনীতির উর্ধে থাকতেই ভালবাসেন। তাই তাঁদের পেশাদার রাজনীতিকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁদের মূল্যবান অবদান যদি পেতে হয় তা হ'লে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে: এঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, ঐতিহাসিক এবং দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি অন্যান্য সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংঘ তাদের প্রতিনিধি স্বরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির নাম রাজ্যসভার সদস্যপদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের রাজ্যসভায় মনোনয়ন করবেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে এই সকল সংঘের সহিত যুক্ত নন

অথচ অনুরূপ গুণের অধিকারী এইরূপ কয়েকজনকেও মনোনীত করতে পারবেন। ধনী ও কায়েমী স্বার্থের প্রভাব এড়াবার জন্য বেতনভোগী কর্মচারী ছাড়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদার হিসাবে বা অন্যভাবে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্বার্থজড়িত থাকবেন তাঁরা যেন এই রাজ্যসভার সদস্য হতে না পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা থাকবে। এই রাজ্য সভার ওপরই অর্থনৈতিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ভার থাকবে এবং সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করে তোলার জন্য কাজকর্ম তদারকী করার অধিকারও এদের থাকবে।

প্রারম্ভেই সমাজের অর্থনৈতিক জীবন যেন ধনীদের দুর্নীতিপূর্ণ ও সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হয়ে উঠতে পারে সেই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তার ফলে আরো বেশী সংখ্যক মানুষ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয়তঃ এই সব স্বাধীন-চিন্তাশীল ব্যক্তিদের তখন জন স্বার্থের বিশ্বস্ত রক্ষক রূপে পাওয়া সম্ভব হবে এবং তাঁরাও এই সব কায়েমী স্বার্থবানদের প্রভাবমুক্ত হয়ে জনকল্যাণকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হবেন। গণতন্ত্রের পূর্ণ-বিকাশের পূর্বে এই মধ্যবর্তী সময়ে যদি মাথা-গুণতির দ্বারাই গণতন্ত্রের প্রতিনিধি নির্বাচন চলতে থাকে তা হলে সমাজ জ্ঞানী-গুণীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ এই সকল জ্ঞানী-গুণীরাই কেবল সমাজকে সত্যকার গণতান্ত্রিক মুক্তির দিকে পরিচালিত করে নিয়ে যেতে পারে।

র‍্যাডিক্যাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের অর্থনীতিকে এরূপভাবে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন যাতে মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণের সম্ভাবনা না থাকে। মানুষের মানসিক ও সুকুমার শক্তি ও বৃত্তি সমূহের বিকাশ নির্ভর করে ব্যক্তির জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব

পূরণের ওপর। জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান মানের উদ্দেশ্যে রচিত পুনর্গঠিত অর্থনীতিই হবে আমূল গণতন্ত্রের ভিত্তি (র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাসি)।*

এই নতুন সমাজের অর্থনীতির ভিত্তি হবে মানুষের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ও প্রয়োজন অনুসারে তা বণ্টন।†

এই সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনে ব্যক্তির সার্বভৌম ক্ষমতা-হস্তান্তরের ব্যবস্থা থাকবে না। কারণ তাতে জনগণকে সবপ্রকার কার্যকরী ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। স্থানীয় গণ-সভা সমূহের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালন কার্যে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের ব্যবস্থাই হবে এই নতুন সমাজের রাষ্ট্রীয় ভিত্তি।

জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিদ্যা চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞান ও অন্যান্য সৃজনমূলক কাজে উৎসাহ দানই হবে এই নতুন সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি।

যে হেতু এই নতুন সমাজ যুক্তিবাদ ও জ্ঞানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে সেই হেতু এই সমাজের সব কিছু সুপরিকল্পিতই হবে। কিন্তু এই পূর্ব-পরিকল্পনাতেও মানুষের স্বাধীনতা যাতে সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। এই নতুন সমাজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়েই গণতান্ত্রিক হবে যে হেতু

---

*১৭শ সূত্র দ্রষ্টব্য। (অনুবাদক)

† ১৮শ সূত্র দ্রষ্টব্য। বর্তমানের মত কেবল বাজারে বিক্রী করে মাত্র লাভের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন হবে না; অর্থাৎ প্রত্যেক কর্মক্ষম মানুষের জীবিকার্জনের জন্য কাজ দিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকবে। (অনুবাদক)

এই গণতন্ত্র প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যক্ষীভূত বাস্তব গণতন্ত্র হবে এবং স্বকীয় শাসনের মধুস্বাদ ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারাই পেতে থাকবে সেই হেতু আপৎকালে প্রত্যেকটি মানুষই এই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য লড়বে এবং রক্ষা করতেও সমর্থ হবে।*

এই আমূল গণতন্ত্রের (র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাসি) আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হবে এক নতুন মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুক্তবুদ্ধি নর-নারীর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়। তারা জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়ে নিয়ে তাদের ভাবী শাসক হবার উদ্দেশ্যে কাজ করবে না ; তারা হবে তাদের বন্ধু, উপদেষ্টা ও পথ প্রদর্শক মাত্র। যে হেতু তাদের উদ্দেশ্য প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তি আনা, সেই হেতু এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে তাদের আচরণ হবে যুক্তি ও নীতিসম্মত জনসাধারণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যতই বাড়বে তাদের প্রচেষ্টাও ততই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। অবশেষে শিক্ষিত ও মার্জিত জনমতের সমর্থনে ও সুবিবেচনার সঙ্গে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের (action of the people) দ্বারা গড়ে উঠবে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্র। ক্ষমতা যদি কতিপয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় তা হলে জনসাধারণের মুক্তিও দূরে সরে যায় ; র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্টদের এই বিশ্বাসের জন্য তারা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে না।†

*প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র সমূহের দুর্বলতার জন্যই কমিউনিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্রকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। এখানে সেই দুর্বলতা খণ্ডনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।—(অনুবাদক)

†১৯শ সূত্র দ্রষ্টব্য।—(অনুবাদক)

তারা স্থানীয় গণসভা সমূহে জনগণকে সংগঠিত করে তুলবে এবং কালক্রমে এইসব গণ-সভাই গণতান্ত্রিক সার্বভৌম ক্ষমতার এক একটি যন্ত্র হয়ে উঠবে। যেহেতু র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্র সমাজের সকল মানুষের প্রত্যক্ষ সমবায়ে গড়ে উঠবে তখন রাষ্ট্র ও সমাজ সমার্থক শব্দ হবে বা উভয়েই একাত্ম হয়ে যাবে, এবং যেহেতু তখন শাসিত জনগণ ও শাসক রাষ্ট্রের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না, সেই হেতু তখন রাষ্ট্র আর দমন-পীড়নের যন্ত্র থাকবে না। কেবল তখনই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণের উপাদানে (of) গঠিত এবং জনগণের দ্বারাই (by) পরিচালিত হওয়া সম্ভব হবে

শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব ও খণ্ডিত না করে সমগ্র সমাজের প্রগতি ও প্রাচুর্যের জন্য সমাজকে পুনর্গঠিত করা একমাত্র গণশিক্ষার দ্বারাই সম্ভব*। স্থানীয় গণসভাগুলি হবে জনগণের রাজনীতি ও সমাজনীতি শিক্ষার বিদ্যাপীঠ। এই র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী এমনই হবে যে যার ফলে স্বার্থশূন্য অনাসক্ত মানুষদের সমাজের পুরোভাগে আনবার সুযোগ করে দেবে। এরূপ মানুষদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র তখন আর বিশালকায় ভয়ঙ্কর জন্তু লেভিয়াথানের মত সন্দেহ ও ভয়ের বস্তু থাকবে না।†

*২০শ সূত্র দ্রষ্টব্য। (অনুবাদক)

†একনায়কতন্ত্রের দ্বারা জোর করে ওপর থেকে জনসাধারণের ওপর ভাল ব্যবস্থা চাপিয়ে দিলেই ভাল হয় না, কারণ মূল্য-value জোর করে সৃষ্টি করা যায় না। তা শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। (অনুবাদক)

মানুষ চিন্তাশীল জীব ; এই চিন্তাশীলতার জন্যই মানুষ এই পৃথিবীকে নিত্য নতুন ভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে, এবং এই চিন্তা কার্য মানুষ ব্যক্তিগত ভাবেই করতে পারে, সমষ্টিগত ভাবে পারে না। বৈপ্লবিক ও মুক্তিকামী সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের কর্তব্য হল, এই ঐতিহাসিক সত্যটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া। মানুষের মস্তিষ্ক একটি উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ এবং তাতে উৎপন্ন হয় সব চেয়ে বড় বৈপ্লবিক জিনিষ। সকল বিপ্লবেরই মূলে আছে পুরাতনের পরিবর্তে নতুন গড়ে তোলার জন্য সৃজনাত্মক চিন্তা। নিজেদের সৃজনীশক্তি সম্বন্ধে সচেতন, নতুন সমাজ গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দুঃসাহসিক ভাব ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত এবং মুক্ত মানুষের সহযোগিতায় সৃষ্ট এক মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ।* নিষ্কাম মুক্তবুদ্ধি মানুষরা যখন সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন কার্যে ব্রতী হবেন একমাত্র তখনই মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খল চূর্ণ হয়ে সকলের জন্য মুক্তি আসবে।

*১৫শ সূত্র দ্রষ্টব্য। (অনুবাদক)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নব মানবতাবাদের মূলসূত্র

নব মানবতাবাদ বাইশটি সূত্রে নিবদ্ধ। সভ্যতার ইতিহাসে ব্যক্তি মানুষ সভ্যতার রথ কেবল টেনেই চলল, কোনও দিন এর সম্পূর্ণ ফলভোগ করতে পারল না। দর্শনের যে অপরিণতির জন্য, অর্থনীতির যে অভাবের জন্য, রাষ্ট্রনীতির যে ত্রুটির জন্য সেটি সম্ভব হয় নি, সে অপরিণতি যতক্ষণ না পরিণত হচ্ছে, অভাব পূরণ হচ্ছে, ত্রুটি সংশোধিত হচ্ছে ততক্ষণ ব্যক্তি মানুষ মুক্তি পাবে না; এবং তার ফলে ব্যক্তি মানুষের উন্নতির, বিকাশের, উন্নততর সভ্যতার পথও অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে; আর সমগ্র মানবজাতি উপর্যুপরি সংকটের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে কেবল অধঃপতন ও ধ্বংসের পথেই পিছিয়ে যাবে।

মানবেন্দ্রনাথ দর্শনের, অর্থনীতির ও রাষ্ট্রনীতির সে প্রয়োজন মিটিয়েছেন। মানবতাবাদ মানব সভ্যতার মতই অতি পুরাতন ভাবনা। সে ভাবনায় এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, এবং ছিল বলেই ব্যক্তি মানুষের চিনির বলদত্ব ঘোচেনি। সেই সব ভুল-ত্রুটি দূর করে তিনি ব্যক্তি মানুষকে প্রকৃত সার্বভৌমত্বের আসনে বসিয়ে মানবতাবাদকে এক নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই জন্য এর নাম দিয়েছেন নব মানবতাবাদ। নিচে বাইশটি সূত্রের ভাবানুবাদ দেওয়া হ'ল; সেই সঙ্গে কিছু কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া হল। তা ছোট অক্ষরে ছাপা হল। [অনুবাদক]

এক

"ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ সাধনই সমাজের আদর্শ। পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাভিত্তিক সামাজিক সম্বন্ধের দ্বারাই ব্যক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তিসমূহের বিকাশ ও উন্নতি ঘটে সত্য, কিন্তু সমাজের উন্নতি-অবনতির বিচার করতে হ'লে তা সমগ্র সমাজকে ধ'রে করলে চলবে না, তা করতে হ'বে প্রতিটি ব্যক্তির উন্নতি বা অবনতি কতখানি ঘটল তা দিয়ে। সমাজ ব্যষ্টি-মানুষের সমষ্টিমাত্র। ব্যষ্টি যখন সমষ্টিতে মেশে তখন ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব ঘুচে গিয়ে একটি নতুন সমষ্টি সত্তার জন্ম ঘটে না, ব্যষ্টি ব্যষ্টিই থেকে যায়। ব্যক্তি মানুষ যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করে সেটুকুর সমষ্টি ছাড়া অন্য সকল সামাজিক উন্নতি, জাতীয় স্বাধীনতা, দেশের মঙ্গল প্রভৃতি কেবল কল্পনা মাত্র; ব্যক্তি মানুষের সে সব কোন কাজেই আসে না। সমাজের উন্নতি, কল্যাণ, অগ্রগতি যদি সত্যিকারের হয় তা হ'লেই তা ব্যক্তির সম্ভোগে লাগে; যদি না লাগে তবে তা কাল্পনিক ভাবনা-মাত্রই থেকে যায়। মানব সমষ্টির যে কোন রূপের উপর—যেমন জাতি, শ্রেণী, গোষ্ঠী প্রভৃতিতে—প্রাণ ও নার্ভতন্ত্র বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূতিক্ষম এক চিণ্ময় সত্তা আরোপ করা ভুল। কারণ এতে যে-ব্যক্তিতে নিয়ে এই সমষ্টি সেই ব্যক্তিকেই বলি দেওয়া হয়। সুখ-দুঃখ অনুভব করার জন্য ব্যক্তির পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং মন আছে। কিন্তু জাতি, শ্রেণী, গোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ বোধের জন্যে সেরূপ পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও মন নেই। সুতরাং জাতি, শ্রেণী, গোষ্ঠী প্রভৃতি সমষ্টি সত্তার সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকতে পারে না। সমষ্টির মঙ্গল, সমাজের উন্নতি, দেশের কল্যাণ,

জাতির গৌরব বলতে সকল ব্যক্তির মঙ্গল, উন্নতি, কল্যাণ ও গৌরবই বোঝায়।”

এই প্রথম সূত্রে জাতীয়তাবাদ, কমিউনিজম, ফ্যাসিজম প্রভৃতি সমষ্টিসত্তাবাদ খণ্ডন ক'রে ব্যক্তি মানুষকে সার্বভৌমত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

দুই

দ্বিতীয় সূত্রে আছে নব-মানবতাবাদের গতি-বিজ্ঞানের বিষয় (Historiology)।

সমাজের আদর্শ যদি ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ সাধন হয় এবং সমাজের উন্নতি বলতে যদি সমাজের ব্যক্তিসমূহের উন্নতিই বোঝায় তা হলে প্রশ্ন ওঠে, মানুষের এই উন্নতি প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা কী?

এ সম্বন্ধে নানা মত আছে। বিষয়টি সভ্যতার বা ইতিহাসের গতি-বিজ্ঞানের (Historiology) মধ্যে পড়ে। মানুষের ইতিহাস রচনা করে কে? মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয় কোন শক্তির প্রেরণায়?

এ বিষয়ে নানা মতের মধ্যে তিনটিই প্রধান :

ধর্মীয় মতে, ঈশ্বর বা গ্রহ-নক্ষত্র মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত করে ও ইতিহাস রচনা করে।

যাঁরা অন্ধ জড়বাদী, তাঁদের মতে, প্রকৃতির সকল বস্তুর মতই মানুষও পরিচালিত হয় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে;

মার্কসের মতে, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে সভ্যতা ও মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়, ইতিহাস রচিত হয়।

মার্কসের গতিতত্ত্বকে দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ বা অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ (Dialectical Materialism বা Economic Determinism) বলা হয়। এই মতে পারিপার্শ্বিক (উৎপাদনের উপায়) মানুষের ওপর ক্রিয়া করার পর

মানুষ প্রতিক্রিয়া জানায়। যদি এই পারিপার্শ্বিকের ক্রিয়া না হয়, তবে প্রতিক্রিয়াও হবে না—মানুষ চিন্তা করবে না, মানুষের সে ক্ষমতা নেই। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ বলা হয়।

রায়ের গতিতত্ত্ব দ্বান্দ্বিক নয়—দৈহিক। মানুষের দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের উর্ধে উঠে, প্রয়োজন হলে, কল্পনার জগৎ গ'ড়ে পারিপার্শ্বিকের নতুন-পুরানো নানা জ্ঞান-অভিজ্ঞতার যোগ-বিয়োগ ক'রে সক্রিয় হবার। পারিপার্শ্বিকের প্রত্যক্ষ প্রভাব নিরপেক্ষ হয়ে ভাব ও ভাবনার, কোন নতুন সৃষ্টির পরিকল্পনা রচনা করার ক্ষমতা তার আছে; এবং তা আছে বলেই মানুষের পক্ষে নতুন বস্তু সৃষ্টি করা, সভ্যতার অগ্রগতি দান, নতুন ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়।

দেখা যাচ্ছে, রায় ব্যতিরেকে অন্য সকল মতে মানুষ খেলার পুতুল, দাবা পাশার ঘুঁটি, স্রোতের তৃণ মাত্র। অন্ধ-জড়বাদী ও মার্কসের মতে মানুষ পারিপার্শ্বিক ও আর্থিক ব্যবস্থার নিকট স্রোতের তৃণের মত অসহায় বা ক্রীতদাস মাত্র।

মানুষের সার্বভৌমত্ব কোন মতবাদেই স্বীকৃত হয়নি। একমাত্র রায়ই সর্ব-প্রথম মানুষের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেন। তিনি বললেন:

"মানবের অগ্রগতির মূল প্রেরণা হ'ল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সত্যানুসন্ধিৎসা (Quest for freedom and search for truth)। এই প্রেরণাতেই মানুষ নিত্য নতুনভাবে তার ভাগ্য গ'ড়ে তোলে, ইতিহাস রচনা করে। জীব-জগতে শুধু টিকে থাকার জন্যে যা ছিল জীবন সংগ্রামের মূল প্রেরণা, সেই আদি জৈব প্রেরণাই মানুষের ক্ষেত্রে ক্রমবিকশিত হ'য়ে বুদ্ধি ও আবেগের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে মানুষের মত বাঁচার জন্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষারূপে দেখা দিল। মানুষের ক্ষেত্রে এই যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ সকল বাধা মুক্ত হয়ে অন্তর্নিহিত

সকল বৃত্তির অনুশীলন ও পরিস্ফুটনের দ্বারা বিকশিত ব্যক্তিত্বের যে সাধনা, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের উপায় সন্ধানের অপর নামই সত্যানুসন্ধিৎসা। প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে, বস্তু জগৎ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ ক'রে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক সকল প্রকার পারিপার্শ্বিকের অত্যাচারে বশীভূত না হ'য়ে প্রকৃতিকে পবাভূত ক'রে, পারিপার্শ্বিককে জয় ক'রে নিজের কাজে লাগাতে, অপর ব্যক্তি ও সমাজকে নিজ বিকাশেব সহযোগী ক'রে তুলতে, নিজের মনকে, নিজের পরিবার পরিজনকেও সহায়ক ক'রে তুলতে হ'লে সঠিক সত্য পথেই চলতে হ'বে, ভুল পথে চললে ঈপ্সিত ফল লাভ হ'বে না। সুতরাং এই সত্যানুসন্ধিৎসা মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করাব জন্যই। সেই জন্যই সত্যানুসন্ধিৎসা মুক্তিব আকাঙ্ক্ষারই অনুসিদ্ধান্ত। সত্য হচ্ছে, মুক্তির পথে চলবার জন্য যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই বিষয়বস্তু ”

এই সূত্রের মধ্যে আছে, "জীবজগতে শুধু টিকে থাকার জন্যে যা ছিল জীবন সংগ্রামের মূল প্রেরণা, সেই আদি জৈব প্রেরণাই মানুষের ক্ষেত্রে ক্রমবিকশিত হয়ে বুদ্ধি ও আবেগের উচ্চস্তরে উন্নীত হযে মানুষের মত বাঁচার জন্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষারূপে দেখা দিল।" এই সার্বিকটি উল্লেখ করে পল্লবগ্রাহী পাঠক ও casual observer-রা বলেন, একথা ঠিক নয়; কারণ সকল মানুষের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নেই। পৃথিবীর বিপ্লবের বা মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা যায়, সমগ্র সমাজের এক মুষ্টিমেয় অংশই অগ্রণী হয়ে বিপ্লব ঘটায় বা অত্যাচারী শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করে। সমাজের বাকী অংশ উদাসীন, নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্রই থাকে। আমেরিকার ক্রীতদাস-প্রথা দূরীকরণ প্রচেষ্টায় অনেক ক্রীতদাসই আপত্তি জানিয়েছিল। সুতরাং রায়ের এই সার্বিকটি ভুল।

উত্তরে বলা যায়ঃ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেমন মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি তেমনি ভয়-সন্দেহ-দুর্ভাবনা, যুক্তিপরায়ণতাও প্রত্যেক মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মনুষ্যেতর জীবজগতের প্রয়োজন মিটে যায় কেবল মাত্র আহার-নিদ্রা-মৈথুনের উপকরণ পাওয়া মাত্র। কিন্তু মানুষের মন বস্তুটির প্রয়োজন সহজে মেটে না। এই মনের অন্তর্নিহিত শক্তি অপরিসীম এবং প্রত্যেক মানুষের সতত প্রচেষ্টা এই সকল শক্তি ও বৃত্তি সমূহের চর্চা বিকাশ-সাধন ও তৃপ্তি লাভের জন্য। কিন্তু মনে সহজাত ভয়-সন্দেহ-দুর্ভাবনা থাকার ফলে অন্ধকারকে, চোখের আড়ালকে, অনাগতকে, নতুনকে তার বড় ভয়। সেই জন্য প্রত্যক্ষ বন্ধন থেকে অপ্রত্যক্ষ মুক্তির যাত্রাপথে এই ভয়-সন্দেহ-দুর্ভাবনা এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। একেই Erich Fromme, 'escape from freedom' বলেছেন।

মানুষের ভয় দূর করে মানুষের আর এক সহজাত প্রবৃত্তি—যুক্তিপরায়ণতা। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মূলে আছে এই যুক্তিপরায়ণতা। আর এই জ্ঞান-বিজ্ঞানই মানুষের চলার পথ আলোকিত করে তোলে—ভয়-সন্দেহ-দুর্ভাবনা কাটিয়ে দেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় মানুষের মন যতই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে থাকে, মনের ভয়-সন্দেহ-দুর্ভাবনাও ততই কমতে থাকে; আর সেই শূন্যস্থান পূর্ণ ক'রে চলে মানুষের অপর এক সহজাত প্রবৃত্তি, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সকল মানুষের মন যখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তখন সকলের মধ্যেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও প্রস্ফুট হ'য়ে উঠবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে একশ বছর আগে নিগ্রোদের মধ্যে মুক্তি সম্বন্ধে যে ভয় ছিল, আজ আর তা নেই। মানুষের যুক্তিবুদ্ধির স্থান যে সকলের উপরে সে কথা রায়ের সূত্রাবলীর অন্যত্র দেওয়া আছে। বিচার করতে হবে বাইশটি সূত্রের সমগ্রকে নিয়েই। বিচ্ছিন্ন বাক্যকে নিয়ে বিচার করলে এইরূপ বিভ্রান্তি ঘটবে। সুতরাং এই যুক্তি দিয়ে বিচার করলে রায়ের এই সার্বিকটিকে ভুল বলা চলে না।

তিন

তৃতীয় সূত্রে মুক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

"ব্যক্তি ও সমাজের সকল প্রকার যুক্তিসম্মত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই হ'ল অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় মুক্তি অর্জন। এই মুক্তির অর্থ হ'ল, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সকল বৃত্তি ও শক্তি বিকশিত ক'রে তোলার পথে যে বাধা আছে তার ক্রমাবলুপ্তি। ব্যক্তির এই বিকশিত ব্যক্তিত্ব কিন্তু একান্তভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনকে আশ্রয় করেই ফুটে উঠবে। ব্যক্তিকে সমাজচক্রের ব্যক্তিত্বহীন অবিচ্ছেদ্য অর্ হিসাবে দেখলে চলবে না—তাতে ব্যক্তির বিকাশ ঘটবে না। যে কোন যৌথ ও সামাজিক সংগঠনের ভালমন্দ, উন্নতি-অবনতির মানদণ্ড ব্যক্তিমানুষ। সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সাফল্য-অসাফল্যের বিচারে দেখতে হ'বে, ব্যষ্টি এর কতটুকু পেল বা পেল না এবং তার উপরেই নির্ভর করবে এই বিচারের রায়।"

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে রায়ের আবাল্যের যে আদর্শ সেই সর্বাঙ্গীন মুক্তির আদর্শ—বিকশিত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার অনুশীলন ও সাধনার পথের সকল বাধা অপসারণই যে মুক্তি, সেই আদর্শই এখানে অপরিবর্তিত আছে! এর সমর্থনে দেরাদুনের নব মানবতাবাদের উদ্বোধনী সম্মেলনে রায়ের সেই বিশেষ উক্তিটির পুনরুল্লেখ করছি। দেখা যাবে যে এই মানবতাবাদ তাঁর শৈশবে যা কল্পনা মাত্র ছিল তাই অবশেষে বৈজ্ঞানিক দর্শনের রূপ নিল। বলা চলে, হিউম্যানিজম ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে পরিণতি লাভ করল।

"আমার বয়স যখন চৌদ্দ—স্কুলে পড়ি, তখন থেকেই আমার রাজনৈতিক জীবনের সুরু। তখন থেকেই আমি মুক্তির সন্ধানে ঘুরছি। হয়তো জীবনটা বৃথাই কেটে যেত, কিছুই মিলত না. তথাপি সেদিন আমার আকুতির

অন্ত ছিল না। একান্তভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাবার নতুন প্রেরণাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। সে দিনের বিপ্লবীরা এইরূপ সর্বাঙ্গীন মুক্তির কামনাই করত। আমরা তখন মার্কস পড়িনি। সর্বহারার—প্রোলেটেরিয়েট-এর অস্তিত্বই তখন আমরা জানতাম না। তথাপি, সারা জীবন জেলে কাটাতে বা ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে অনেকের বাধে নি। তখন তাদের উৎসাহিত করতে সেদিন কোন প্রোলেটেরিয়েট ছিল না, শ্রেণী-বিরোধ সম্বন্ধে চেতনাও তখন তাদের মনে কেউ জাগিয়ে তোলে নি, কমিউনিজমের কথা তারা স্বপ্নেও সেদিন শোনে নি তবু তারা সাধারণ মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য ও গ্লানিতে অভিভূত হ'য়ে মানবিক প্রেরণাতেই বিদ্রোহী হয়েছিল। ঠিক কোন্ পথে সে সব দুঃখ দারিদ্র্য দূর হবে তারা তা তখন জানত না; তবু তারা তাদের প্রাণ পর্যন্ত পণ রেখেই যে কোন উপায়ে তা দূর করতে চেয়েছিল। আমার রাজনৈতিক জীবন এই প্রেরণা (spirit) থেকেই সুরু। এখনও মার্কসের তিন খণ্ড ক্যাপিটাল বা মার্কসবাদীদের তিনশ গ্রন্থ থেকে আমি প্রেরণা পাই না—আমার প্রেরণা আসে আবাল্যের সেই মুক্তিলাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই।"

চার

চতুর্থ সূত্র দ্বিতীয় সূত্রেরই অংশ। ইতিহাসের গতিবিজ্ঞানের তত্ত্বসন্ধানে সেখানে বলা হয়েছে, "মানুষের অগ্রগতির মূল প্রেরণা হ'ল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেই প্রেরণাতেই মানুষ ইতিহাস রচনা করে চলেছে।" কিন্তু মানুষ যে ইতিহাস রচনা করছে, তার সে ক্ষমতার উৎস কোথায়? চতুর্থ সূত্রে তারই সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

মানুষের মনের দুটি দিক। এক, যুক্তিসঙ্গত ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। দুই, ইচ্ছা বা ভাবাবেগ প্রকাশ করার ক্ষমতা। শারীরবৃত্তের দিক থেকে ভাবাবেগ প্রকাশের কেন্দ্রের উপর যুক্তিবুদ্ধির কেন্দ্রের যেমন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে

চমনি যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলে এই ভাবাবেগ প্রকাশের ক্ষমতাই ান্নুষকে অশুভ কাজ, অসামাজিক কাজ, ক্ষতিকর কাজ করাতে পারে।

এযাবৎ ইচ্ছা বা ভাবাবেগ প্রকাশের এবং যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতাকে ়থক করে দেখা হ'য়েছে। অশুভ ইচ্ছা ও বিবেক যেন দুই পৃথক শক্তি। াশুভ ইচ্ছার উদ্ভব, যোনিদ্বারে যার জন্ম সেই জন্মগত পাপী মানুষের মন থকে, আর শুভ ইচ্ছা ও বিবেকের আবির্ভাব ঘটে অলৌকিক শুভ শক্তি ঈশ্বরের নুগ্রহে।

মানুষের সৌভাগ্য রচনা, কল্যাণকর ইতিহাস গড়ে তোলা শুভ জ্ঞান-বুদ্ধি-বেকের সাহায্য ছাড়া হয় না। অতএব মানুষের ভাগ্য গড়ে তোলা, সভ্যতা ও তিহাস রচনার ক্ষমতা জন্মগত অশুভ মনের অধিকারী মানুষের থাকতে পারে া! এ কাজ সেই অলৌকিক মঙ্গলময় ঈশ্বরের।

কিন্তু আধুনিক শারীরবৃত্তের জ্ঞান বিদ্যার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে, চাবাবেগের কেন্দ্র হ'ল থেলেমাস (লঘু মস্তিষ্ক)। তার উপরে অবস্থিত সরিব্রাল হেমিসফিয়ার—মানুষের গুরু মস্তিষ্ক। ইহা অন্য কোন জীবের নেই। হাই জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের কেন্দ্র। সংজ্ঞাবহ নার্ভ দিয়ে উদ্দীপনা প্রথমে আসে ই থেলেমাসে। থেলেমাস তা গুরু মস্তিষ্কে পাঠায়। এই গুরু মস্তিষ্কের ক্ষমতা াছে খানিকটা ভেবে চিন্তে, জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে বিচার-বিবেচনার পর াতিক্রিয়া জানাবার। তার ফলে প্রতিক্রিয়া শুভ হয়। একেই আমরা াবেকের ক্রিয়া বলি। কিন্তু সব সময় মস্তিষ্ক তা করে না। এটা কুঁড়েমির ন্যই হোক বা ঝিমিয়ে থাকার জন্যই হোক বা দীর্ঘ অভ্যাসের ফলেই conditioning) হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, নিজ বিবেচনা ক্তি প্রয়োগ না ক'রেই প্রতিক্রিয়া জানায়; ষড়রিপুর ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া-গুলি এই ভাবেই হয়।

শুভ-অশুভ বুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষেরই মস্তিষ্ক প্রসূত—কোন অলৌকিক দেবতা া দানবের দ্বারা আদিষ্ট নয়। আধুনিক শারীরবৃত্ত বিদ্যা অনুসারে মানুষের

অশুভ বুদ্ধিও যেমন আছে, শুভ বুদ্ধিও তেমন আছে। মানুষের যুক্তিবুদ্ধির চিন্তাশক্তি ও বিবেকের যে কেন্দ্র সেই কেন্দ্রই মানুষের নার্ভতন্ত্রের শীর্ষস্থানে অবস্থিত এবং সমগ্র নার্ভতন্ত্রের উপরেই তার সর্বাধিনায়কত্ব।

অতএব মানুষ স্বভাবতই যুক্তিপরায়ণ। এই যুক্তিপরায়ণতাই মানুষকে বিবেকপরায়ণ করে, নীতিপরায়ণ করে এবং নীতিপরায়ণ মানুষই মানুষের সৌভাগ্য গড়ে, শুভ ইতিহাস রচনা করে, নব নব সভ্যতার পত্তন করে।

এই সব কথাই বীজাকারে চতুর্থ সূত্রে আছে ঃ

"এই নিয়ম নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে উদ্ভূত ব'লে মানুষও প্রধানতঃ যুক্তিবাদী। মানুষের এই যুক্তিশীলতা তার সহজাত দৈহিক বৃত্তি, এজন্যই এটি মানুষের ইচ্ছাশক্তি বা আবেগের বিপরীত ধর্মী নয়। মানুষের যুক্তিবুদ্ধি ও ভাবাবেগ যে একই মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত হয় তা প্রমাণ করা যায়। নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে উদ্ভূত যে মানুষ তার মনও যে পারিপার্শ্বিকের দাস হ'বে এ কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। কিন্তু প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উদ্ভূত হ'লেও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বাত- থাকে যে, সে তখন পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত ও নির্দেশিত হয়ে পারিপার্শ্বিককেই প্রভাবিত ও নির্দেশিত করতে পারে। যে জন্যে ইতিহাসের গতিবিজ্ঞানের মধ্যে এই ইচ্ছাশক্তির স্থান সকলের উপরে। সভ্যতার ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাসে মানুষের ইচ্ছাশক্তি যতখানি স্থান ততটা আর কোন শক্তিরই নেই। তা না হ'লে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত ও চালিত বিপ্লবের স্থান সমাজ ও সভ্যতা বিবর্তনের ইতিহাসে থাকত না। এই যে যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা সামাজিক ঘটনাবলীকে প্রভাবিত ও নির্দেশিত করা, একে যেন ধর্মীয় নির্দেশ্যব

। অদৃষ্টবাদের সঙ্গে এক করে ফেলা না হয়; কারণ এ দুইয়ের অর্থ ম্পূর্ণ বিভিন্ন।"

ধর্মীয় নির্দেশ্যবাদ ও অদৃষ্টবাদের বক্তব্য হ'ল ঈশ্বর বা গ্রহনক্ষত্র এই সৃষ্টির দেশ্য, মানুষের ভাগ্য, সবকিছুই পূর্বাহ্নে ঠিক করে রেখেছেন; সেই উদ্দেশ্যের তিই সমগ্র সৃষ্টি ধাবমান; ক্ষুদ্র মানুষের খোদার উপর খোদাকারী করার ধিকারও নেই, সামর্থ্যও নেই।

পক্ষান্তরে এই সূত্রে বলা হ'ল মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি পরিচালিত ইচ্ছা ও াবেগই মানুষকে মুক্তির পথে চালিয়ে নিয়ে যায়, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের ন্যে প্রয়োজনীয় সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র গড়ে তোলে। অবশ্যই প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার দ্বারা সে সৃষ্টি সীমিত।

মার্কসের দ্বান্দ্বিক গতিতত্ত্বকেও মানুষের মন রূপ দৈহিক গতিতত্ত্ব দিয়ে এখানে খণ্ডন করা হ'ল।

এই চতুর্থ সূত্রটিই নব মানবতাবাদের সর্বপ্রধান সূত্র, সমগ্র কাঠামোর মুধনী কাঠ, খিলানের key stone.

পাঁচ

পঞ্চম সূত্র দ্বিতীয় ও চতুর্থ সূত্রেরই অংশবিশেষ। এতেও ইতিহাসের গতিবিজ্ঞানের তত্ত্বই আলোচিত হয়েছে। বিশেষ ক'রে এই পঞ্চম সূত্রে মার্কসের ইতিহাসের গতিবিজ্ঞানের সার্বভৌমত্ব খণ্ডন ক'রে তার আংশিক সত্যকে স্বীকার করা হয়েছে।

অর্থাৎ আর্থিক বিধিব্যবস্থা মানুষের ইচ্ছাকে মুখ্যতঃ প্রভাবিত করে না— গৌণতঃ করতে পারে।

"মার্কসের অর্থ নৈতিক নির্দেশ্যবাদ বস্তুবাদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত। এই মতবাদে যখন বলা হয়, আর্থিক বিধিব্যবস্থা মনকে

নির্দেশিত করে তখন আর্থিক ব্যবস্থা ও মন দুই ভিন্ন বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায় এইভাবে মার্কসীয় মতবাদে বস্তুবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বস্তুবাদে মনকেও সমগ্র পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই ধরে নেওয়া হয় বলে বস্তুবাদ এক অদ্বৈতবাদী দর্শন। ইতিহাস বিনা চেষ্টায় রচিত হয় না, তাকে গড়ে তোলা হয়। এই গড়ে তোলার পিছনে নানা কারণ থাকে। মানুষের ইচ্ছা এই কারণ সমূহের অন্যতম এবং আর্থিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকেই যে এই ইচ্ছার উদ্ভব ন সব সময় সত্য নয়।"

ছয়

ষষ্ট সূত্রটিও ইতিহাসের গতিবিজ্ঞান সূত্র সমূহেরই অংশ বিশেষ।

"চিন্তা, ভাব ও ভাবনা একটি শারীরিক প্রক্রিয়া। ইহা পরিবেশ চেতনা সঞ্জাত—একবার গঠিত হয়ে গেলে স্বাধীনভাবে নিজস্ব নিয়মেই চলে। ভাব ও ভাবনার গতি ও সমাজের বিবর্তনের ধারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করতে করতে সমান্তরাল পথে চলতে থাকে। বিভিন্ন মতবাদ যে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সভ্যতার সামগ্রিক বিবর্তনে এমন কোন নজির নেই।

[এখানে "মতবাদ" ও মানুষেব চিন্তা-ভাবনাকে পৃথক করে দেখা হচ্ছে। চিন্তার দ্বারা মানুষের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। কিন্তু "মতবাদ" হ'ল অপর কোন ব্যক্তি বা বিভিন্ন ব্যক্তিসমূহের দ্বারা পূর্বাহ্নে চিন্তিত ভাব ও ভাবনার ফলস্বরূপ। সেই জন্যে ঐতিহাসিক ঘটনা যখন ঘটে তখন পুরাতন "মতবাদের" সঙ্গে তখনকার নতুন মানুষের ভাব

ও ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটে এবং সেই পুরাতন "মতবাদ" বহুলাংশে সংশোধিত, পরিশীলিত বা বিকৃত হয়ে যায়।]

"শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নৈতিকমূল্য কেবলমাত্র প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি নয়—উহা সমাজের ভাব ও ভাবনার নিজস্ব নিয়মে সমাজের অপরিহার্য প্রয়োজনেই গড়ে ওঠে।"

সাত

প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে,—"ব্যক্তিই সমাজের আদর্শ।"

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, "মানুষই মুক্তির প্রেরণায় সভ্যতা গড়ে চলেছে, ইতিহাস রচনা ক'রে চলেছে।"

তৃতীয় সূত্রে এই মুক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র দ্বিতীয় সূত্রের মতই ইতিহাসের গতিবিজ্ঞান বিষয়ক।

সপ্তম সূত্র এর পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর। মানুষই যদি মানুষের ভাগ্য গড়ে, সভ্যতার সৃষ্টি করে, ইতিহাস রচনা করে তা হ'লে সেই ভাগ্যের, সেই সভ্যতার সেই ইতিহাসের 'বৈজ্ঞানিক স্বরূপ' কী, ত্রুটিবিচ্যুতিহীন প্যাটার্ণ কী? যার ফলে মানুষ তার বিকশিত ব্যক্তিত্ব লাভ ক'রে জীবনকে সার্থক, উপভোগ্য, পরম রমনীয় করে তুলতে পারবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে প্রথমেই প্রচলিত মতবাদের মধ্যে সর্বাগ্রে যার স্থান সেই কমিউনিজম ও সোস্যালিজমের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটন ক'রে আদর্শ সমাজের প্রকৃত স্বরূপ কী হওয়া উচিত তারই মূল নীতি বিবৃত করা হয়েছে।

"সকল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাধনার জন্যে সর্ববাধা মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হ'লে কেবল মাত্র সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস-কল্পে বিপ্লব সংগঠন করলে চলবে না, উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির বিকাশের

পক্ষে সকল প্রকার বাধা অপসারণের ব্যবস্থা করা। উৎপীড়িত বঞ্চিত মানুষের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ক'রে উৎপাদনের উপায় সমূহকে ব্যক্তিগত মালিকানার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করে দিলেই যে ব্যক্তি মানুষের ঈপ্সিত মুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।"

আট

সপ্তম সূত্রেরই অনুস্যূতি এই অষ্টম সূত্র। এতে কমিউনিজমের সমষ্টিবাদ ও তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে একনায়কত্ব স্থাপনের যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।

"তর্কের খাতিরে যদি বিশ্বাস করা হয় যে কমিউনিজম বা সোস্যালিজমের সূত্র অনুসারে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুললে ব্যক্তিমানুষের মুক্তি আসবে, তা হলেও সে প্রত্যয় যাচাই করে নিতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে ; অর্থাৎ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে যা ঘটেছে, সেই বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিল ক'রে। যে রাষ্ট্রে ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় রক্ত মাংসে গড়া পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট ব্যক্তি-মানুষের সুখ-দুঃখ-অনুভূতিকে অস্বীকার ক'রে জাতি বা শ্রেণীর স্বার্থে ব্যক্তিকে একটি কাল্পনিক সমষ্টি সত্তার কাছে বলি দেওয়া হয়, সেখানে আর যাই হোক ব্যক্তি মানুষের মুক্তি মেলে না। স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে স্বাধীন করে দেওয়া যেমন অর্থহীন কথা, তেমনি ব্যক্তিকে সমাজের বা শ্রেণীর বা দেশের কল্যাণের নামে বলি দিয়ে ব্যক্তির মুক্তির ব্যবস্থাও অনুরূপ অর্থহীন কথা। যে সমাজ দর্শনে বা সমাজ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃত, ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তির আদর্শকে অর্থহীন ও

অন্তঃসারশূন্য ব'লে উড়িয়ে দেওয়া হয় সে দর্শন ও পরিকল্পনাকে সত্যিকারের প্রগতিমূলক ও বৈপ্লবিক বলা চলে না।"

নয়

দরিদ্র জনসাধারণের কাছে কমিউনিষ্টদের যে সাম্যবাদী অর্থনীতির মন ভোলানো আবেদন, অর্থাৎ পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী অর্থনীতি—প্ল্যানড্ ইকনমি, যা কেবল লাভের উদ্দেশ্যে নয় শুধু মানুষের অভাব দূর করবার মুখ্য উদ্দেশ্যে গড়ে তোলার অঙ্গীকার, তা যে কতদূর অলীক এবং জনসাধারণকে আর্থিক অভাব থেকে মুক্তি দেবার ভাঁওতা দিয়ে রাষ্ট্র ডিকটেটরসিপ স্থাপন ক'রে দোর্দণ্ড প্রতাপে স্বৈরাচার চালাবার কৌশল ও মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র, তা এই সূত্রে বলা হয়েছে।

"রাষ্ট্র যখন সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তখন কমিউনিজমের রাজত্বকালে রাষ্ট্র শুক্‌নো পাতার মত ঝরে গিয়ে লুপ্ত হবে এ শুধু যে কথার কথা ও কল্পনাবিলাস মাত্র তা কমিউনিজমের অর্ধ শতাব্দী কালব্যাপী রাজত্বের ইতিহাস থেকেই বোঝা গেছে। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যকে সরকারী আয়ত্তাধীনে এনে পূর্ব পরিকল্পিত ছক অনুসারে উৎপাদন, বণ্টন ও বিক্রয় ব্যবস্থা পরিচালিত করতে হ'লে সরকারের ক্ষমতা ও দক্ষতা অতিমাত্রায় বাড়াতে হয়। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগ ও কর্মপরিচালন বিভাগের উপরে গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব থাকলেই তবে জনসাধারণের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে ; যার ফলে প্ল্যান্‌ড অর্থনীতির দ্বারা জনসাধারণের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস হয়ে চরম দাসত্বের স্তরে অবনমিত হয় না। বাজারে লাভের উদ্দেশ্যে নয়, শুধু মানুষের প্রয়োজনে যে উৎপাদন পরিকল্পনা তা একমাত্র গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিরাপত্তার ভিত্তিতেই সম্ভব হ'তে পারে।"

দশ

দশম ও একাদশ সূত্রেও কমিউনিজমের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে সমালোচনা চলেছে। পূর্বে মার্কসের ইতিহাসের গতি-বিজ্ঞান, যার নাম অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ, তার অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করা হয়েছে। মার্কসের শ্রেণী সংগ্রাম ও প্রোলেটেরিয়েট শ্রেণীর একাধিপত্যের সূত্রকেও বর্জন করা হয়েছে সমষ্টিসত্তাবাদের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা ক'রে। নিম্নলিখিত দুই সূত্রে মার্কসের "বাড়তি মূল্য" সূত্রের ত্রুটি উদ্ঘাটন করা হচ্ছে; এবং যে কটি সূত্রে মার্কসবাদের সমালোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে মার্কসের দ্বান্দ্বিকের সূত্রেরও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে; অর্থাৎ মার্কসের চারিটি সূত্রকেই খণ্ডন করা হয়েছে। রায়ের এই গ্রন্থের অন্যত্র ও Reason, Romanticism & Revolution গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

"কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের মালিকানা সরকারের হাতে গেলে এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তন হলেই যে শ্রমিক শোষণ বন্ধ হ'য়ে যাবে কিংবা ধন-বণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে তেমন কোন নিশ্চয়তা নেই।* অর্থনীতিতে গণতন্ত্র না থাকলেও রাজনৈতিক গণতন্ত্র সম্ভব কিন্তু রাজনৈতিক গণতন্ত্র না থাকলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সম্ভব নয়।"

এগারো

"একনায়কত্ব একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লে আর হটতে চায় না। ডিকটেটরি শাসনের অধীনে যখন সমাজের সকল কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত হ'তে থাকে তখন অনেক বেশী কাজ

* রুশিয়ায় ধনবণ্টনে সাম্য আসে নি। ধনতন্ত্রের মতই রুশিয়ায় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রও শ্রমিকের বাড়তি মূল্য Surplus Value অপহরণ ক'রে শ্রমিককে ঠিকই শোষণ করে এবং বেশী পরিমাণেই করে; তার জন্যেই রুশিয়ায় দ্রুত মূলধন সঞ্চয় ও শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে।

করার সুবিধার দোহাই দিয়ে, দক্ষতা ও দলবদ্ধতা বৃদ্ধির অজুহাতে এবং দ্রুত উন্নতিলাভের প্রলোভন দেখিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চস্তরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার করা হয় তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যে উদ্দেশ্য লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় শুধু সেই একনায়কত্বের জন্যই সে উদ্দেশ্য আর সফল হয় না।"

বারো

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সূত্রে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসি ও তার দর্শন লিবারেলি-জমকে সমালোচনা ও খণ্ডন করা হয়েছে।

"প্রতিনিধি মারফৎ শাসনতন্ত্র, যার নাম পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসি, তারও ত্রুটি-বিচ্যুতি অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ধরা পড়েছে। এই ত্রুটি আছে প্রতিনিধির হাতে জনসাধারণের সার্বভৌম রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করে দেবার ব্যবস্থার মধ্যে। গণতন্ত্রকে যদি কার্যকরী ও সফল করে তুলতে হয় তা হ'লে সার্বভৌম ক্ষমতাকে সকল সময়ের জন্যেই জন-সাধারণের হাতে রাখতে হবে। কিছুদিন অন্তর অন্তর সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের পরিবর্তে জনগণ যাতে দৈনন্দিন শাসন কার্যেও তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন অসংহত নাগরিকরা কোন রকমেই সক্রিয় হয়ে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিতে পারে না; সেই জন্যে প্রায় সকল সময়েই তারা নিষ্ক্রিয় ও ক্ষমতাহীন হয়েই থাকে। নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের উপর স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন উপায়ই তাদের হাতে থাকে না।"

তেরো

"লিবারেলিজম (উদারনৈতিক মতবাদ) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের হাতে প'ড়ে অর্থহীন ও মিথ্যা ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে। অবাধ বাণিজ্য নীতি (laissez faire) নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি সৃষ্টি করে; ফলে সবল ও দক্ষ মানুষের হাতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অদক্ষ মানুষের পরাজয় ও শোষণকেই আইন সংগত ক'রে তোলে মাত্র। ব্যক্তি যখন কেবল আহার-নিদ্রা-মৈথুনসর্বস্ব জীব মাত্রে পরিণত হল (economic man) এবং সেই জীব ধর্মের পরিমাপ করা হল টাকা পয়সার মাপকাঠি দিয়ে, তখন উদারনীতি ব্যক্তির মুক্তিলাভের যে দার্শনিক মতবাদ ও অঙ্গীকার দিয়েছিল তা মিথ্যা হয়ে গেল। এই যে মনুষ্যধর্ম বিবর্জিত নিছক জীবধর্মী ইকনমিক ম্যান, সে টাকা পয়সার জন্যে হয় নিজে দাস হবে, নয়ত অন্যকে দাস ক'রে শোষণ করবে। মানুষ সম্বন্ধে এই অতি স্থূল ইতর ধারণার পরিবর্তে তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে হবে। প্রকৃত মানুষ হ'ল যুক্তিশীল, বুদ্ধিমান ও নীতিপরায়ণ জীব। এই নীতিপরায়ণতা মানুষের স্বাভাবিক যুক্তিশীলতা থেকেই এসেছে*। পরিবেশের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে মানুষ ভাল-মন্দ, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে প্রতিক্রিয়া জানায়; এই বিবেচনা কার্যই মানুষের বিবেক। এই বিবেক নির্দেশিত আচরণকেই নীতিপরায়ণতা বলা হয়। চৈতন্যের সম্যক প্রক্রিয়াকেই বিবেক বলে। অর্থাৎ

* অপরের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহারের নামই নীতিপরায়ণতা। অপর মানুষের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করতে হলে, তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার না করলে প্রতিদানে অনুরূপ সদ্ব্যবহার পাওয়া যাবে না—এই যুক্তিবুদ্ধি থেকেই সকল মানুষ নীতি-পরায়ণ হওয়ার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছে।

মানুষের গুরুমস্তিষ্কের সৎ-অসৎ, অগ্র-পশ্চাৎ ভাবনার নামই বিবেক। সুতরাং বিবেক বুদ্ধি হ'ল যুক্তিসম্মত ভাবনা।"

পল্লবগ্রাহী পাঠক দ্বিতীয় সূত্রের মতই এই সূত্রটির মধ্যেও ক্রটি আবিষ্কার করেন। " who is moral because he is rational—মানুষের নীতি-পরায়ণতা তার যুক্তিপরায়ণতা থেকেই উদ্ভূত"—এই বাক্যাংশটি সম্বন্ধে তাঁদের আপত্তি। তাঁরা বলেন, যুক্তিপরায়ণতা থেকেই যদি নীতিপরায়ণতা আসে তবে সব মানুষই ত' যুক্তিপরায়ণ, কিন্তু সবাই নীতিপরায়ণ হয় না কেন ?

এর উত্তরে বলতে হয়ঃ এই সূত্রের সম্যক অর্থ ও তাৎপর্য একটু ব্যাপক। শব্দার্থ দিয়ে সেটা বোঝা যাবে না। নৃ-বিজ্ঞান (Anthropology) পাঠ করলেই জানা যাবে, মানুষের নীতিপরায়ণতার উৎস মানুষের যুক্তিপরায়ণতা। ক্রীতদাস হওয়া বা ক্রীতদাসদের প্রভু হওয়া মনুষ্য সমাজের শাশ্বত স্বাভাবিক নিয়ম নয়। এটা অস্বাভাবিক ও সাময়িক অবস্থা মাত্র। এটা অসামাজিকতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা। যুক্তিবুদ্ধি লব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে। যুক্তি লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ আবিষ্কার করেছে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচারই (মর‍্যালিটি) হ'ল সমাজের বন্ধন, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সহযোগিতা করার সিমেণ্ট। সমাজ গড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসনের প্রবর্তন করেছে। অতএব নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, সামাজিক মানুষ আর নীতিপরায়ণ মানুষ সমার্থক। এই শাশ্বত সার্বিকটি (universal) ভুলে মানুষ যখন অসামাজিক হয় তখনই সমাজ ভাঙ্গে। উদারনৈতিকদের ধনতন্ত্রের যুগে এই সার্বিকটি মানুষ ভুলেছে বলেই সুখ শান্তির সকল উপাচার আজ থাকা সত্ত্বেও মানুষের দুঃখ-দুর্দশার, ভয়-ভাবনার অবধি নাই।

এই সূত্রের এই বাক্যাংশটি যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা যায়, তা হ'লে সমগ্র সূত্রটির তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হবে না।

চৌদ্দ

প্রথম সূত্র থেকে ষষ্ঠ সূত্রের মধ্যে এই দর্শনের মূলতত্ত্বকে স্থাপন করা হয়েছে।

এই দর্শন প্রয়োগের ফলে যে সমাজ গড়ে উঠবে তার সম্ভাব্য প্রকল্প দেওয়া হয়েছে পরবর্তী সূত্রসমূহে।

প্রথমে যে দু' প্রকার সমাজ ব্যবস্থা চলছে, সেই পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্র ও প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং কমিউনিষ্টদের পার্টি একাধিপত্য শাসিত রাষ্ট্র ও সোস্যালিষ্ট অর্থনীতিকে যুক্তি ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সাহায্যে খণ্ডন করা হয়েছে।

তারপর চতুর্দশ সূত্র থেকে ব্যক্তি মানুষের বিকশিত হয়ে উঠবার পথের সকল বাধা ক্রমশঃ দূরীভূত করার জন্যে যে ধরণের রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উপযোগী হবে তারই সম্ভাব্য প্রকল্প দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতার দ্বারা যদি বোঝা যায়, এটি আদর্শের উপযোগী হচ্ছে না তবে যে সব কারণের জন্যে তা হচ্ছে না সেই কারণগুলি পুনরায় দূরীভূত করে আরও ত্রুটিমুক্ত রাষ্ট্র ও অর্থনীতির নতুন প্রকল্পের সন্ধান করতে হবে। এই হবে মানুষের Quest for freedom and search for truth (Thesis 2) -এর চিরন্তন পথ পরিক্রমণ।

প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমূহকে উল্টো পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কারণ এ সকল রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা থাকে মাথায়, প্রতিনিধির হাতে—আর তলায় থাকে শূন্য, জনসাধারণের হাতে কিছু থাকে না। এখানে যে রাষ্ট্ররূপের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে তলায়, জনসাধারণের হাতে—আর মাথায় থাকে শূন্য; প্রতিনিধিরা প্রতিনিধি মাত্রই থাকেন—সার্বভৌমত্ব লাভ করেন না। সেইজন্য এই আমূলগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সিধা পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

"রাষ্ট্রে ও সমাজে একনায়কত্ব কায়েম করে পার্লামেণ্টারি ডেমো-ক্র্যাসির ত্রুটি দূর করা যায় না। এই ত্রুটি দূর করা সম্ভব বর্তমানের ক্ষমতাহীন বিচ্ছিন্ন মানুষকে সংহত ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সংঘবদ্ধ ক'রে! গ্রামে গ্রামে সকল মানুষকে গ্রামসভার মধ্যে সংঘবদ্ধ করে তুলতে হ'বে। এই গ্রামসভা যে গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করবে সেই পঞ্চায়েতের সদস্যগণ গ্রামসভার সকল মানুষের কাছে সকল সময়ের জন্যই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকবে ও নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকবে। সেই দেশব্যাপী পঞ্চায়েৎ সমূহের মাথার উপর থাকবে পিরামিডের চূড়ার মত পার্লামেণ্ট বা লোকসভা। রাষ্ট্র হবে সমগ্র সমাজের সঙ্গে একাত্মক। তার ফলে মানুষ রাষ্ট্রকে সকল সময়েই প্রত্যক্ষ করায়ত্তের মধ্যে রাখতে সক্ষম হ'বে।"

পনর

"যে বৈপ্লবিক দর্শন ব্যক্তি মানুষের মুক্তি পথের সন্ধান দেবে সেই দর্শনের সর্বপ্রধান কর্তব্য হ'বে এই ঐতিহাসিক সত্যটির প্রতি গুরুত্ব প্রদান যে মানুষই এই সংসার, সমাজ, সম্পদ গ'ড়ে তোলে, এবং তা সম্ভব হয় তার চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা আছে ব'লে, এবং সেই চিন্তা ভাবনা কেবল ব্যক্তিগতভাবেই সম্ভব। মানুষের মস্তিষ্ক উৎপাদনের এক যন্ত্রবিশেষ এবং তা থেকে উৎপন্ন হয় সবচেয়ে বৈপ্লবিক পণ্য সামগ্রী অর্থাৎ বৈপ্লবিক ভাব ও ভাবনা। বিপ্লব মাত্রেরই মূলে আছে পুরাতনকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন গ'ড়ে তোলার ভাব ও ভাবনা। নিজেদের সৃষ্টি ক্ষমতায় সচেতন, নতুন সংসার-সমাজ গড়ে তোলার অদম্য সঙ্কল্পে সুদৃঢ়, চিন্তাক্ষেত্রে নব নব দুঃসাহসিক অভিযানে

অনুপ্রাণিত এবং মুক্ত মানুষের সমবায়ে মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার আদর্শে উদ্দীপিত মানুষের সংখ্যা যতই বাড়বে ততই গড়ে উঠবে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকুল পরিবেশ এবং তখনই প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'য়ে উঠবে।"

ষোল

এই সূত্রে এইরূপ ঈপ্সিত আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার পদ্ধতি ও কর্মসূচী (methodology) সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই পদ্ধতি মানুষকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের দ্বারা তার ব্যক্তিত্ব ও তার অন্তর্নিহিত বৃত্তি ও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে এবং সেই সকল বৃত্তি ও শক্তি অনুশীলন করে বিকশিত করে তুললে ব্যক্তি মানুষের জীবন যে কী সীমাহীনভাবে উপভোগ্য ও আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে তার উপলব্ধির ব্যবস্থাও উক্ত পদ্ধতির কাজ। কিন্তু এই শিক্ষা কেবল বই পড়িয়ে বা বক্তৃতা শুনিয়ে হবে না; সে শিক্ষা গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে দিতে হবে এবং এই শিক্ষা তাদের দেবে রেনেসাঁসে উদ্বুদ্ধ নতুন মানুষেরা।

"বিপ্লবের পদ্ধতি ও কর্মসূচী রচনা করতে হবে বাঞ্ছিত সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সম্মুখে রেখে। ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশের জন্যে মুক্ত সমাজের প্রয়োজনীয়তা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সঙ্গে বসবাসের উপযোগিতা বিষয়ে শিক্ষা দেবার একনিষ্ঠ ব্যাপক প্রচেষ্টা থেকেই সমাজে আসবে নব-জাগরণ তথা রেনেসাঁস। মানুষকে গ্রামসভার মধ্যে সংহত ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। এই গ্রামসভার দ্বারা নির্বাচিত ও প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিই হবে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। এই ঈপ্সিত সমাজবিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন ক্রমবর্ধিত হারে বহুসংখ্যক

নবজাগ্রত রেনেসাঁসী মানুষের ; এবং এই সব মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটাতে হ'বে ক্রমপ্রসারী দেশব্যাপী গ্রামসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের সঙ্গে। আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের কর্মসূচী রচনা করতে হবে এমনভাবে যাতে এই বৈপ্লবিক কর্মসূচীর সুসংগত ও যুক্তিসম্মত পরিণতি ঘটে সকল মানুষের মুক্তিতে, সুসংগত সামাজিক সম্পর্ক রচনায়। এই বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়ণের ফলে সকল প্রকার ধনতান্ত্রিক শোষণ ও কায়েমী স্বার্থের প্রভাব ও শাসন থেকে সমাজ জীবন হ'বে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।"

সতর

"আমূলগণতন্ত্রে সমাজের অর্থনীতিকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা হবে যার ফলে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটে। ক্রমবর্ধিত পরিমাণে সকল মানুষের অশন-আসন-বসন-ভূষণের প্রয়োজন মেটানোর উপরেই নির্ভর করে তার অন্তর্নিহিত সকল বৃত্তি ও শক্তিসমূহের পূর্ণ বিকাশ। এইরূপ ক্রমবর্ধমান আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপরেই আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। সর্ব সাধারণের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যই হ'ল মুক্তির লক্ষ্যে পৌছিবার প্রধানতম সর্ত।"

আঠার

"নতুন সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি হ'বে প্রয়োজন মেটানোর জন্যে উৎপাদন—লাভের জন্যে নয়, এবং বণ্টন হবে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে। রাজনৈতিক সংগঠনে প্রতিনিধি মারফৎ শাসন-ব্যবস্থার

কোন স্থানই থাকবে না ; কারণ প্রতিনিধি মারফৎ শাসন ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা চলে যায় প্রতিনিধিদের হাতে—জনসাধারণের হাতে কিছুই থাকে না। জনসাধারণ চির নাবালকই রয়ে যায়। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দ্বারা নির্বাচিত ও প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের মারফৎ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণই হবে এই নতুন সমাজের রাজনৈতিক ভিত্তি। এই সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠবে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের উপর। এই শিক্ষাদানের নীতি হবে বৈজ্ঞানিক ও সৃষ্টিমূলক কাজে যথা সম্ভব কম বাধা নিষেধ আরোপ ও যতবেশী সম্ভব উৎসাহ দান। এই নতুন সমাজ যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গঠিত হবে এবং তার অপচয় নিবারণের জন্যে একটি পরিকল্পনাও থাকবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য থাকবে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা। এই নতুন সমাজ হ'বে সব দিক থেকেই গণতান্ত্রিক। রাজনীতিতে হ'বে আমূল গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না, সবার অধিকার হবে সমান ; সাংস্কৃতিক জীবনও গড়ে উঠবে সকলপ্রকার অনুশাসন মুক্ত হয়ে দায়িত্বশীল সৃজনাত্মক। অনুপ্রেরণায়। এবং যেহেতু এই গণতন্ত্রে সকল মানুষেরই জীবন উপভোগ্য ও সুখকর হয়ে উঠবে সেই হেতু বিপৎকালে এই গণতন্ত্রকে একান্ত নিজস্ব জ্ঞানে সকলে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে, এর জন্য প্রাণ পণ করবে।*

* ইউরোপের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র যখন ফ্যাসিজম বা কমিউনিজম দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তখন তা রক্ষা করতে সে সব দেশের জনগণ এগিয়ে আসে নি ; কিন্তু এই আমূল গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকায় জনসাধারণ আপৎকালে একে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে।

উনিশ

"মুক্ত মানুষের সমাজ গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অনাসক্ত মানুষের ংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই আমূল গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হ'বে। াই সব অনাসক্ত মুক্তবুদ্ধি মানুষ ভবিষ্যতে জনসাধারণের শাসক হ'য়ে াড়াবে না—তারা হ'বে জনসাধারণের বন্ধু, উপদেষ্টা ও পথ-প্রদর্শক, ফ্রেণ্ডস, ফিলজফার, গাইড্)। সর্বাঙ্গীন মুক্তির লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি াজায় রেখে চলতে গেলেই এদের রাজনৈতিক কাজ-কর্ম খেয়াল খুশী াত হবে না, হবে যুক্তি সম্মত, অর্থাৎ নীতি সম্মত। জনসাধারণের মুক্তি াকাঙ্ক্ষার পরিধি যত বেড়ে চলতে থাকবে এদের প্রচেষ্টা ও র্মক্ষমতাও সেই অনুপাতে বেড়ে চলবে। অবশেষে রাজনৈতিক ও মাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের সমর্থনে ও সুচিন্তিত ক্রিয়া-কলাপে গড়ে উঠবে আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি কন্দ্রীভূত হয়, তা হ'লে জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, লুপ্ত হয়; সই জন্য আমূল গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে যথাসম্ভব জন-সাধারণের াধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা করে চলবে।"

কুড়ি

এই সূত্রটিও আমূল গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার পদ্ধতি methodology) সম্বন্ধে। পূর্বে বলা হয়েছে, শিক্ষাদানই হ'ল এই পদ্ধতি। াই বিশেষ প্রকার শিক্ষাদান পদ্ধতির কৌশলটি বিবৃত করা হয়েছে এই সূত্রে।

"ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব না করেও উন্নত ও সকল মানুষের ল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে তখনই যখন জন- াধারণের মধ্যে সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার

হবে। এই প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিদ্যাপীঠ হবে গ্রামসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলি। আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র ও কার্য পরিচালন ব্যবস্থাই পরার্থপর অনাসক্ত মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের পুরোভাগে এনে দেবে। এইরূপ পরার্থপর অনাসক্ত মানুষের দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্র যখন পরিচালিত হ'তে থাকবে তখন রাষ্ট্র আর শ্রেণীবিশেষ দ্বারা অপর শ্রেণীকে দমন করবার অস্ত্র হ'য়ে উঠবে না।* অনাসক্ত মানুষরা যখন ক্ষমতার আসনে বসবে কেবল তখনই মানুষের চলার পথের সকল বাধা বন্ধন চূর্ণ করে এরা মুক্ত মানুষের জন্যে মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করবে।"

একুশ

"এই নবমানবতাবাদ সমাজের ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে যাতে আধুনিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত করা সম্ভব হয় তার পরিকল্পনা দিয়েছে ; ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সামঞ্জস্য বিধান করেছে ; নৈতিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক মুল্য আরোপ ক'রে এবং এই সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে মুক্তির সংজ্ঞাকে একটি সার্থক আদর্শ হিসাবে গ'ড়ে তুলেছে ; এই মতবাদ সভ্যতার গতি বিজ্ঞানের পুরাতন ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন ক'রে এক নিখুঁত গতিবিজ্ঞান রচনা করেছে। এই গতিবিজ্ঞানে মার্কসের দ্বান্দ্বিক অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের আংশিক সত্যটুকু স্বীকৃত হয়েছে এবং সভ্যতা রচনায়

*এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, মার্কস রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন এই বলে যে রাষ্ট্র হ'ল এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমন করে রাখবার হাতিয়ার বিশেষ, এই সূত্রে যারা রায় সেই মত খণ্ডন করে বলছেন, রাষ্ট্রের সর্বজনীন জনহিতকর রূপও হ'তে পারে এবং এখানে সেই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্ররূপেরই মূলসূত্র ও পরিকল্পনা দিচ্ছেন।

মানুষের ভাব ও ভাবনার যথাযোগ্য মূল্যও দেওয়া হয়েছে; এবং এই সামাজিক গতি বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারেই এই যুগের বিপ্লবের জন্যে এক নতুন পদ্ধতি ও কর্মসূচী রচনা করেছে।"

বাইশ

"এই নব মানবতাবাদ বা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট মতবাদের মূল প্রত্যয় হ'ল প্রোটাগোরাসের ভাষায়—ব্যক্তি মানুষই সব কিছুর মানদণ্ড—Man is the measure of everything"—কিংবা মার্কসের ভাষায়, "ব্যক্তি মানুষই মানব জাতির মূল—Man is the root of mankind" এবং এই দর্শন দিয়েছে এক মুক্তমনা নীতিনিষ্ঠ মানুষের সমবায়ে বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ।"

নব মানবতাবাদের এই বাইশটি সূত্র থেকে যেটি স্পষ্ট হ'য়ে উঠল সেটি হ'ল. এই দর্শন বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদের দর্শন। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তালার সাধনায় যে সব বাধা দেখা দেবে তা ক্রমবর্ধিত হারে দূরীকরণের ব্যবস্থা বে এই দর্শন রূপায়ণের সাহায্যে।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে আছে মোটামুটি তিন বাধা। সকল মানুষকেই এই তিন বাধা অতিক্রম করেই এ পথে চলতে হয়।

প্রথম বাধা হচ্ছে, এই প্রকৃতির বাধা। মানুষকে পদে পদে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হয়। মানুষের নানা প্রয়োজন মেটাতে, আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে প্রকৃতি সহজে দেয় না, তা আদায় করে নিতে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে।

দ্বিতীয় বাধা হ'ল, অপর মানুষ, প্রতিবেশী, সংসার সমাজের অসংখ্য নরনারী ও সমগ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা-সমূহ। সমাজেরই বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আছে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের সংস্থাসমূহ।

ব্যক্তির অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বীয় বিকাশের পক্ষে সহায়ক শিক্ষা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হ'লে চাই রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব।

তৃতীয় বাধা হ'ল, বক্তির অন্তরের বাধা। ব্যক্তির মনে অহর্নিশ যে পরস্পর বিরোধী ভাল মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা জাগছে তা যদি সুশৃঙ্খলিত না হয়, সুসংস্কৃত ন হয়, একাগ্র করার মত শক্তির অভাব হয়, তবে ব্যক্তির উন্নতি ও ক্রমবিকাশ ব হয়ে যায়।

এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রথম ও তৃতীয় বাধা অপসারণ করতে মানুষের যত সময় শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক কম প্রয়োজন হ দ্বিতীয় বাধা অপসারণের জন্য। বিশেষতঃ রাজনীতির জন্য।

অর্থাৎ নব মানবতাবাদ ব্যক্তিজীবনে রূপায়িত করে তোলার জন্য (র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলন, তা যতটা না রাজনৈতিক তার চেয়ে ঢে বেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক। মানুষ যদি শিক্ষিত হয়, সচেতন হয়, বিদগ্ধ হ তা হলে কি গ্রাম পঞ্চায়েতে, কি লোকসভা বা সংসদে সঠিক প্রতিনিধি বে নিতে ভুল হবার বা বিশেষ হৈ চৈ-এ সময় ক্ষেপণ করার কথা নয়, এবং নির্বাচক মণ্ডলী যদি মূর্খ না হয়ে বিদগ্ধ হয় তা হ'লেও সেই নির্বাচক-মণ্ডলীর নির্দেশে পরিচালিত হতে প্রতিনিধিবর্গ ব্যগ্রই হবেন।

সুতরাং নব-মানবতাবাদ অনুসারে এক কথায় বলা যায় যে, নিজেকে শিক্ষিত সংস্কৃত, অনুশীলিত, বিদগ্ধ, বিকশিত ক'রে তোলার সাধনাই মানুষকে তার 'না স্তরেরেই' মুক্তি এনে দেবে।

নব মানবতাবাদ রূপায়ণের কর্মসূচী

[১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শেষ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব]

দু'বছর পূর্বে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নিখিল ভারত সম্মেলনে বাইশটি সূত্রের আকারে নব-মানবতাবাদের মূলতত্ত্ব গৃহীত হয়। বিগত বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর সমসাময়িক পৃথিবী যে সংকটের সম্মুখীন হয় তার সমাধান হিসাবেই উপরোক্ত দার্শনিক তত্ত্ব ও তা থেকে অনুসৃত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি রচিত হয়। আজ সেই সংকটের প্রধান লক্ষণগুলি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দু বছর আগে সে লক্ষণগুলি অস্পৃষ্ট থাকলেও আমাদের চোখে ধরা পড়েছিল। ইতিমধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে সমস্যার প্রকৃতি ও তার সমাধান সম্পর্কে আমরা যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তা যে যথার্থই হয়েছে তা প্রমাণিত হয়েছে।

নব-মানবতাবাদের মূলসূত্রগুলি যদি বিশ্ব-সংকটের প্রকৃতি ও তার গুরুত্বের সঠিক পরিমাপ করতে সক্ষম হয়ে থাকে তা হলে তা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারলে সে সংকটের সমাধান সম্ভব হবে। নব-মানবতাবাদের বাস্তব রূপায়ণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে সব সন্দেহ দেখা দিয়েছে, যে রোগ নব-মানবতাবাদ নিরাময় করতে চায়, এই সন্দেহ সেই রোগেরই লক্ষণ মাত্র। রাজনীতি ও তার কার্য-কলাপ সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সে সন্দেহের উদ্ভব।

এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই আমরা এতদিন জনসাধারণকে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসাবে দেখে এসেছি।

পুরাতন সকল রাজনীতিই তাদের সমস্ত প্রগতিশীল তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। যে সকল অবস্থা আজ আর নেই, বহু পূর্বেই যা লোপ পেয়েছে, সেই সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আজো সকল রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচিত হচ্ছে, এবং সেই অনুসারে কাজকর্মও পরিচালিত হচ্ছে। সমাজের ভারসাম্য বজায় রেখে চলার যোগ্যতা সম্বন্ধে ধনতন্ত্র নিজ গুণে আজ আর লোকের সমর্থন পাচ্ছে না। পৃথিবীর বহু স্থানে ধনতন্ত্রের পতন ঘটেছে! এবং প্রায় সর্বত্রই ধনতন্ত্র তার নৈতিক প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছে। তার ফলে যে সামাজিক বিপর্যয় ঘটেছে তাতে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। একদিকে জনসাধারণের একটা বড় অংশ নিরাপত্তা বোধের অভাবে জাতি কিংবা শ্রেণীর নামে ক্রমেই বেশী করে একনায়কত্বের আবেদনে সাড়া দিতে সুরু করেছে। সমষ্টি সত্তার কাছে নিজের ব্যক্তি সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিত্ব ও চিন্তার স্বাধীনতার বিনিময়ে নিরাপত্তা ও ক্ষমতা অর্জনের মিথ্যা মোহ তাদের মুগ্ধ করে রেখেছে। অন্যদিকে ধনতন্ত্রের এই অবক্ষয়ের ফলে সমাজের নেতৃত্ব ধনিকদের হস্তচ্যুত হয়ে ক্রমশঃ ক্ষমতা দখলকারী রাজনৈতিক দলের নেতাদের করতলগত হচ্ছে। এই জন্য বর্তমানে রাজনীতিই ক্ষমতায় আসার একমাত্র পথ হয়ে উঠেছে। রাজনীতির এই যে নব রূপায়ণ এর জন্য আর একটি তৃতীয় উপাদান আছে। প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বাণিজ্যের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার (laissez faire) পরিবর্তে স্থান গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। দেশের সমগ্র অর্থনীতি যদি

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে তা হলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আরো ব্যাপক হয়, আরো শক্তিশালী হয়। পার্টি পরিচালিত রাষ্ট্র-নিয়ন্তাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। ক্ষমতা লোলুপ রাজনীতির প্রধান লক্ষ্যই হল নিরঙ্কুশ-ক্ষমতা লাভ এবং তার ফলে গড়ে ওঠে এক জবরদস্ত একনায়কতন্ত্র।

ধনতন্ত্রের যুগ শেষ হয়ে যে ক্ষমতা লোলুপ রাজনীতির যুগ সুরু হয়ে গেছে এ কথাটা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না। পৃথিবীর রাজনীতি আজ ধনতন্ত্রের সমর্থক ও বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে যায় নি, বিভক্ত হয়েছে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লোলুপ দুই একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী দুই শক্তির মধ্যে। সেই সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বামপন্থী কি দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা হবে সে প্রশ্ন অবান্তর, কারণ জনগণের পক্ষে ফল তার একই হবে। বাম দক্ষিণ যে কোন একনায়কতন্ত্রই জনগণের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং জনকল্যাণের পক্ষে সমান ক্ষতিকর। সুতরাং প্রশ্নটা এখন আর ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে নয়। এখন বিচার্য হল: এক দিকে ক্ষমতা লোলুপ একনায়কতন্ত্র, আর এক দিকে গণতন্ত্র, এর কোনটিকে বেছে নেব? এই অবস্থায় রাজনীতি সম্বন্ধে পুরোনো প্রচলিত ধারণা ত্যাগ করতে হবে, গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে চিন্তা করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী নিয়ে যে সব দল বামপন্থী বলে পরিচিত হচ্ছে, তারা মাঝে মাঝে গণতন্ত্রের কথা বললেও বর্তমান যুগের সংকটের কোন সমাধান তারা দিতে পারছে না। প্রথমতঃ তাদের কর্মসূচীতে উৎপাদন যন্ত্র, বণ্টন ও বিনিময় জাতীয়করণের যে ব্যবস্থা আছে তাতে এ যুগের যে প্রধান সমস্যা—কী ভাবে গণতন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়িত

করে তোলা যায়—সেই সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের কর্মসূচীর সঙ্গে দক্ষিণ পন্থীদের কর্মসূচীর কোন তফাৎ নেই। ব্যক্তিগত ধনতন্ত্র ও অবাধ প্রতিযোগিতা আজ আর চলছে না। তাই দক্ষিণ পন্থীরাও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সমর্থক হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অর্থ হচ্ছে উৎপাদন যন্ত্র, বণ্টন ও বিনিময় ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। উপরন্তু জাতীয় অর্থনীতি রাষ্ট্রীয়করণের দ্বারা ক্ষমতার যে কেন্দ্রীকরণ ঘটবে তা নিবারণের ব্যবস্থা বাম দক্ষিণ কারো কর্মসূচীর মধ্যে নেই। উভয়েই পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষণা করেন, এবং এই পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রে বিভিন্ন পার্টিদের মধ্যে ভোট ভাগ হয়ে গিয়ে সংখ্যা লঘিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত দলই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র দখল ক'রে জনগণের নামে রাজত্ব চালাতে থাকে, জনগণের সার্বভৌমত্ব শুধু মাত্র নামেই থেকে যায়। রাষ্ট্রের ওপর জনগণের কার্যকরী কর্তৃত্ব যদি না থাকে তবে "সমাজতন্ত্রের" নামে সমাজের অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্বে মানুষের মুক্তি লাভ ঘটে না। সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক রূপ যদি পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসি হয় তবে শেষ পর্যন্ত তা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র বা ষ্টেট ক্যাপিট্যালিজমে দাঁড়ায়।

দক্ষিণ ও বাম পন্থীদের উপরিউক্ত কর্মসূচীর ঐক্যের চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক আচরণ বিষয়ে ঐক্য। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে এই দলগুলি যে সব উপায় অবলম্বন করে তা তাদের ঘোষিত গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। জনপ্রিয়তা লাভের জন্য তারা জনসাধারণের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য জনসাধারণের যে গুরুবাদী মনোভাব

আছে তাকে উৎসাহিত করে। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হ'ল আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী, আত্মমর্যাদা ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ। অথচ দক্ষিণ পন্থীদের মতই বামপন্থীরাও সমভাবে জনগণের এই কর্তাভজা মনোভাবের ওপর নির্ভরশীল। শ্রেণী স্বার্থের সমষ্টিবাদী আবেদনের সঙ্গে তারা জাতীয় সর্বগ্রাসী আবেদন যোগ করেছে। ফলে সমাজতন্ত্রীরা ব্যক্তির আদর্শের পরিপন্থী জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী হয়েছে। বিভিন্ন দলের কর্মসূচী ও রাজনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে সব পার্থক্য লুপ্ত হবার ফলে তাদের পরস্পরের দ্বন্দ্ব রূপ নিয়েছে ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে। এই দ্বন্দ্বে শুধু যে প্রগতির কোন সম্ভাবনা নেই তা নয়, এর দ্বারা তারা গণতন্ত্রের সাংস্কৃতিক মূল্যবান অবদান সমূহের এবং মূল্যমানের ধ্বংসও নিয়ে এসেছে। এই ক্ষমতার লড়াই বিভিন্ন দেশের একনায়কতন্ত্রী শক্তি সমূহের বিকাশে সহায়তা ক'রে জগতকে এক সর্বনাশা মহাযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত করে পল্লীতে পল্লীতে ছড়িয়ে দেবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। ক্ষমতার লড়াই-এ যে পার্টি যত বেশী বড় বড় কথা ব'লে জনসাধারণকে ধাপ্পা দিতে পারবে অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন ক'রে বীর পূজায় মাতিয়ে তুলতে পারবে, সে পার্টিরই আবেদন জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠবে এবং সেই জিতবে। ক্ষমতার লড়াইয়ে যোগ দিয়ে কোন দলের পক্ষেই তার আভ্যন্তরীণ সংগঠনে এবং জনসাধারণের সহিত আচরণে ও অঙ্গীকারে গণতান্ত্রিক মূল্যমান স্থির রেখে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। এই জন্যেই কোন পার্টি একবার ক্ষমতা দখল করলে সে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

সামাজিক ও প্রাকৃতিক দর্শনে নানা অযুক্তিবাদ, নব-মিষ্টিকবাদ এবং ইতিহাস ও রাজনীতিতে নিয়তিবাদের সঙ্গে তাল রেখে রাজনীতিতেও একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। মানুষ যে কিছুই বোঝে না এবং ঘটনা প্রবাহ রোধ করার সাধ্য যে তার নেই, এই বোধ মানুষের সৃজনী শক্তির প্রতি আস্থা একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। যে ইউরোপীয় রেনেসাঁস অল্পসময়ের মধ্যে ইউরোপীয় মানুষকে মুক্তির পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল সেই রেনেসাঁসের মানবতাবাদী ঐতিহ্য আজ সর্বত্রই অবহেলিত হচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদের আদর্শ ত্যাগ ক'রে পাশ্চাত্যের দেশ সমূহ পর্যন্ত আজ ভারতের মত প্রাচ্য দেশ সমূহ, যেখানে রেনেসাঁসের দার্শনিক বিপ্লব এখনো ঘটে নি, সেখানকার অদৃষ্টবাদ ও অন্ধবিশ্বাসের ঐতিহ্য থেকে নিজেদের এই প্রতিক্রিয়াশীলতার সমর্থন খুঁজে পাচ্ছে। মানুষ যে নিজবুদ্ধি ও সৃজনী শক্তির বলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা সৃষ্টি ক'রে বিপুল শক্তি লাভ করেছে সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের যে আছে সে সম্বন্ধে আজ একটা পৃথিবী ব্যাপী সন্দেহের ভাব দেখা দিয়েছে।

রাষ্ট্র পরিচালন কার্যে জনসাধারণের যোগ্যতার প্রতি অনাস্থা থেকেই গড়ে উঠল রাজতন্ত্রের পরিবর্তে তথাকথিত গণতন্ত্র অর্থাৎ প্রতিনিধি মারফৎ শাসনতন্ত্র। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রে প্রতিনিধির হাতে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেবার ব্যবস্থা থকোর ফলে—সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার জনগণের—গণতন্ত্রের এই আদর্শ আর থাকে না। যে সব বামপন্থী পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে থাকে তারাও যুক্তি দেয়, যদিও যুক্তিটা ভুয়ো, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ছাড়া তাদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি হবে না এবং তা না হলে

গণতন্ত্রও সম্ভব নয় ; এবং জনসাধারণের এই আবশ্যকীয় আর্থিক উন্নতি ক্ষমতাসীন মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণের দ্বারাই সম্ভব। এই যুক্তি থেকেই ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ও সদাশয় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অজুহাত আসে। কিন্তু একনায়কতন্ত্র একবার প্রতিষ্ঠিত হ'লে তা চিরস্থায়ী হয়েই থাকতে চায়। শাসক শ্রেণী কোনদিনই এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, যার ফলে তাদের ক্ষমতাচ্যুত হ'তে হয়। ফলে জনসাধারণ সম্পূর্ণ ভাবে অসহায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

মানবতাবাদী ঐতিহ্যের পুনর্ঘোষণার দ্বারাই প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ব্যক্তি মানুষই তার নিজ জগতের ভাল-মন্দ বিচারের একক মাপকাঠি। মানুষ যখন স্বভাবতঃ যুক্তিশীল, তখন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভে সে সক্ষম। জীবনকে উন্নততর করে গড়ে তোলার প্রচেস্টা থেকেই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক মূল্যবোধের ক্রমঃবিকাশ সম্ভব হয়েছে। এ সামর্থ শুধু কয়েকজন কিংবা একটা বিশেষ অর্থ-নৈতিক স্তরের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। আর্থিক প্রাচুর্য সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করে বটে, কিন্তু প্রথমটি ছাড়া অপরটি হয় না, বলা ঐতিহাসিক দিক থেকে ভুল এবং যুক্তির দিক থেকে টেকে না। আর্থিক প্রাচুর্যের ফলে মানুষের মানসিক বিকাশ ঘটে নি, জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষের চিন্তা শক্তির ও জ্ঞান বুদ্ধির ক্রমঃবিকাশ সম্ভব হয়েছে।*

ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোন বৃহৎ সামাজিক পরিবর্তনের পূর্বে ভাব ও ভাবনার পরিবর্তন ঘ'টে দার্শনিক বিপ্লব ঘটেছে। রাজনৈতিক

*মার্কসের অর্থ নৈতিক নির্দেশ্যবাদের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করা হচ্ছে।
—(অনুবাদক

ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের পূর্ব সর্ত হচ্ছে মানসিক ক্ষেত্রে মুক্তিলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা। আর্থিক অনটন, রাজনৈতিক উৎপীড়ন এবং সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে সে অবস্থা মেনে না নিয়ে তা পরিবর্তনের ইচ্ছা সাধারণ মানুষের মনে জাগতে পারে এবং তা কার্যকরী করে তোলার মত সামর্থ্যও দেখা দিতে পারে। বিজ্ঞানসম্মত মানবতাবাদ স্বীকার করে না যে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও তা অর্জনের ক্ষমতা কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় মানুষেরই আয়ত্তাধীন এবং একমাত্র তারাই সমাজের নেতৃত্ব করতে পারে।

র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটদের যে পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল, ক্ষমতা লোভী রাজনৈতিক পার্টিগুলির দ্বারা সাধারণ মানুষের মুক্তি আসবে না, সে সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত ছিল তা সমসাময়িক সংকটের প্রধান লক্ষণ সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। নব মানবতাবাদ দর্শনে মুক্তির যে সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছে, সেই মুক্তি আন্দোলন কেবলমাত্র রাজনীতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না, তা জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেও চলবে ; সেই জন্য পুরাতন ছাঁচে গঠিত কোন রাজনৈতিক পার্টির দ্বারা এই আন্দোলন সংগঠিত হতে বা পরিচালিত হতে পারে না। ক্ষমতার কাড়াকাড়ি থেকে দূরে থেকে এই আন্দোলন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য মূল্যবান সাংস্কৃতিক গুণাবলী অর্জনের জন্য জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলবে এবং তালিম দিয়ে চলবে। এই আন্দোলনের প্রাথমিক কর্তব্য হবে জীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি গড়ে তোলা। ভারতের বর্তমান অবস্থায় বেশ কিছুদিন ধরে এটাই হবে এই আন্দোলনের প্রধানতম কর্তব্য। এই নতুন দৃষ্টি ভঙ্গির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে

তুলতে হবে পল্লীতে পল্লীতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান—গণসভা সমূহ, তার ফলে ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হবে।

এই আন্দোলন থেকে উদ্ভূত ভাব ও ভাবনা কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তার ফলে নতুন ভাব ও ভাবনা নিয়ে নতুন নরনারী এগিয়ে আসবে। তারা প্রতিষ্ঠা করবে নতুন সমাজ সম্পর্ক, গড়ে তুলবে নতুন ছাঁচের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ। এ আন্দোলন হবে অতি ব্যাপক—একাধারে দার্শনিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক। ক্ষমতা যদি জনগণের হাতে না থাকে তবে তা জনগণের স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়—এ সত্য উপলব্ধি করে পরিশেষে এই পার্টি ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য ত্যাগ করেছে। এই পার্টির মূল নীতির সঙ্গে কোন দিনই এটা খাপ খায় নি। তবুও যে পার্টির কর্মসূচীতে সেটা ছিল তার কারণ পার্টি রাজনীতির পুরাতন প্রভাব এড়াতে না পেরে। বর্তমানে নীতির এই পরিবর্তনের দ্বারা পুরাতন পার্টি ব্যবস্থা ত্যাগ ক'রে তা উর্ধ্বে উঠে গেছে

এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটরা নব-মানবতাবাদ দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো কার্যকরী ভাবে এক ব্যাপক ও সামগ্রিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিজেদের পুনর্গঠন করবে এবং এর নাম হবে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলন। এই নতুন নাম করণের দ্বারা একদিকে যেমন র‍্যাডিক্যালদের কর্মসূচী ও

*মানবেন্দ্রনাথ রচিত ও র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কর্তৃক গৃহীত স্বাধীন ভারতের খসড়া সংবিধানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থাই ছিল—পার্টির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিধি ছিল না। —(অনুবাদক)

দৈনন্দিন কাজকর্মের আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে, অন্যদিকে এই নতুন নামের অর্থ থেকে বোঝা যাবে আন্দোলনের ব্যাপক প্রকৃতি। এই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে রাজনৈতিক পার্টিগুলির উদ্দেশ্য, কাজকর্ম ও সংগঠনের সঙ্গে এই আন্দোলনের কত তফাৎ। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের অগ্রগতির বিচার আর তখন অনুগামীদের সংখ্যা দিয়ে হবে না, বিচার হবে জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ, যুক্তিশীলতা ও লোকায়ত নীতিপরায়ণতার প্রসার ও রাষ্ট্রের ওপর তার আদর্শের ও মতবাদের ক্রমঃবর্ধমান প্রভাব দিয়ে।

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে সমাজকে এরূপ ভাবে পুনর্গঠন করা, যার ফলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তি সমূহের সম্যক অনুশীলন ও তৃপ্তির দ্বারা বিকশিত হয়ে ওঠার পথে যে সব অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বাধা আছে, তা ক্রমশঃ যেন অপসারিত হয়।

র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিগত সম্মেলনে বাইশটি মূল সূত্রের সাহায্যে যে দর্শন গ্রহণ করা হয়েছে, তাতেই নতুন সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্ররূপের একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া হয়েছে। সেই রাষ্ট্ররূপকে বাস্তবে রূপদানের জন্য চার বছর পূর্বে স্বাধীন ভারত সংবিধানের খসড়া রচনা করা হয়েছিল। এই নতুন রাষ্ট্র হবে সংহত গণতন্ত্র। এই সংহত গণতন্ত্রে জনগণ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগ ও শাসন পরিচালন বিভাগের ওপর স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ও দৈনন্দিন নজর রাখতে সক্ষম হবে। এই রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে যে পার্লামেণ্ট বা লোকসভা থাকবে তার ভিত্তি হবে দেশব্যাপী ছোট ছোট গণ-সভা সমূহ। এই গণসভা সমূহ হবে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষ

ভাবে প্রয়োগ করার এক একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্র সমূহে জনগণ প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ভাল-মন্দ বিচার বিবেচনা ও দায়িত্বপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রয়োগ ও খবরদারির মধ্য দিয়েই তাদের রাজনৈতিক সামাজিক ও নাগরিক চেতনা ও শিক্ষা দ্রুত বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হবে। এই গণসভাগুলি তখন কেবল সংহত ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রাথমিক ভিত্তিই হবে না, জনগণের শিক্ষা সংস্কৃতি লাভের এক একটি বিদ্যাপীঠে পরিণত হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ন্যস্ত হবে সৎ মুক্তবুদ্ধি ধীমান নিরাসক্ত নর-নারীর ওপব।

নতুন সমাজের অর্থনীতিরও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ব্যক্তি-মানবের স্বাধীনতা ও কল্যাণ বিধানের উদ্দেশ্যে এই অর্থনীতি পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে গড়ে উঠবে। এই অর্থনাতিতে এক দিকে যেমন বাজারে বিক্রা করে লাভ করার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের নীতি পরিত্যাগ ক'রে মানুষের প্রয়োজন মেটানর উদ্দেশ্যে উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করবে, (অর্থাৎ সকলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় সামর্থ্যের জন্য কাজের ব্যবস্থা থাকবে) অন্যদিকে ক্ষমতার অপ্রয়োজনীয় প্রয়োগের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ নীতির কড়াকড়ি হ্রাস করার ব্যবস্থা থাকবে। উৎপাদন বৃদ্ধি করার অজুহাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হবে না। সুতরাং এ অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক হবে না, হবে সমবায়িক। এই অর্থনীতি গড়ে উঠবে দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত উৎপাদক ও ক্রেতা সমবায়েয় ভিত্তির ওপর। এই সংস্থা সমূহের মধ্য দিয়েই জনগণ সমাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্য পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করবে। এই সমবায়ী অর্থনীতি আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবে ; এবং নানাবিধ জন কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ মূলক

সেবাকার্যের মাধ্যমে সামাজিক উদ্বৃত্তি অর্থাৎ সমগ্র অর্থনীতিতে যেটা লাভ হবে সেটা বণ্টনের ব্যবস্থা করবে।

সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি কতটা স্বাধীনতা সম্ভোগ করতে পারবে তা দিয়েই নির্ধারিত হবে এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী।

মুক্ত ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি মানুষের সমবায়ে যে সামাজিক পরিবেশ ও আবহাওয়া গড়ে উঠবে তার থেকেই গড়ে উঠবে এই নতুন সমাজের নতুন সংস্কৃতি। কলা ও বিজ্ঞানের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের কাজ হবে না, পরিবর্তে সৃজনমূলক কর্ম প্রচেস্টা যাতে সব চেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা লাভ করে রাষ্ট্র সেই রূপ পরিবেশ সৃষ্টি করবে, প্রেরণা জোগাবে।

এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল, নব মানবতাবাদ দর্শনের প্রচারের দ্বারা এবং রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের অন্যান্য সমস্যা সমাধানে এই দর্শনের প্রয়োগের দ্বারা এক নতুন সংস্কৃতি, এক নতুন সভ্যতা গড়ে তোলা।

এই আন্দোলনের তাত্বিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্টগণ তাদের দর্শনকে সর্বদাই যাচাই করে চলবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে, আধুনিক জ্ঞান অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার ক'রে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করবে। এই সঙ্গে জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে এই দর্শন যে কতখানি ফলপ্রদ তা দেখিয়ে তারা জনগণের মধ্যে এই দর্শনের মূলনীতিগুলি প্রচারের চেষ্টা করবে। মানুষের মধ্যে যে সহজাত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে, সে সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলবে, মানুষই যে

তার ভাগ্য গড়ে তুলতে পারে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে; সার্বভৌম ক্ষমতা যে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার সে সম্বন্ধে সচেতন ক'রে ব্যক্তির মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের উদ্বোধন করবে; মনুষ্য জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে কেবল নিজের যুক্তিসঙ্গত সঠিক চিন্তার দ্বারাই সেই বন্য জীবন থেকে সভ্য জীবনে উন্নত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে সেই দৃষ্টান্তের দ্বারা সঠিক চিন্তা করার পদ্ধতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে; প্রতিবেশীর সঙ্গে সদব্যবহার না ক'রে সমাজে যে পাশাপাশি বাস করা যায় না এবং তার জন্য যে এক সর্বজন গ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন মেনে চলতে হয়, সে কথার তাৎপর্য জনগণকে বুঝিয়ে বলবে; এবং জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ব্যক্তি মানুষের সার্বভৌমত্বের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরাষ্ট্র ও বিশ্ব-সৌভ্রাত্রের আদর্শ প্রচার করে চলবে। জনগণকে নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়ে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্টরা অজ্ঞতা, অদৃষ্টবাদ, অন্ধবিশ্বাস, হতাশা ও অসহায়তা বোধ দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করে চলবে এবং দেখিয়ে দেবে যে জনগণের মধ্যে এই সব ত্রুটি আছে বলেই গুরু, নেতা, পার্টি ডিকটেটরদের রাজত্ব ও মোড়লি করা সম্ভব হয়। সমাজের মধ্যে যে সব প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ আছে তা সবের ব্যক্তির সুখ-সুবিধা ও মঙ্গলের মাপকাঠি দিয়ে পুনরায় মূল্যায়ন করবে।

মানুষের মধ্যে উদ্যোগী ইচ্ছার জাগরণ ঘটিয়ে ও সমবেত প্রচেষ্টার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্টরা জনগণের সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হিসাবে গণ-সভা ও সমবায় অর্থনীতির প্রাথমিক একক হিসাবে সমবায় সমিতি সমূহ গড়ে তুলবে।

গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার ও গণতন্ত্রের এই সকল মূলভিত্তি গুলির কর্মতৎপরতার ফলে রাষ্ট্রের ওপর জনসাধারণের অধিকতর কর্তৃত্ব স্থাপন করা সম্ভব হবে। এই সব গণ-সভাকে আইনসভাতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য মুক্তবুদ্ধি নীতিপরায়ণ নর-নারীকে বাছাই করার কাজে সহায়তা ক'রে এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হবে এবং সমবায় অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হবে। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, দায়িত্ববোধ বিশিষ্ট মুক্তিকামী সদস্যদের নিয়ে গঠিত দেশব্যাপী গণসভার পরিচালক গণ-পঞ্চায়েৎ গুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রাথমিক একক ও সার্বভৌমক্ষমতার আধার রূপে গড়ে উঠবে। এরাই হবে তখন প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সক্রিয় ভিত্তি।

বিজ্ঞান ও সমাজ

[দেরাদুনে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মুশুরিতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মে থেকে ৪ঠা জুনে অনুষ্ঠিত নিদাঘ-শিক্ষা শিবিরের উদ্বোধনী ভাষণ।]

সমসাময়িক বিশ্ব-সমাজ যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে গত বছরের শিক্ষা শিবিরে তা আলোচিত হয়েছে। সে আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম, বর্তমান সংকট ত্রাণের জন্য প্রয়োজন এমন এক নতুন সমাজ দর্শনের, যে দর্শনে-রাজনীতি ও সমাজনীতিতে নীতিপরায়ণতার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজনীতির প্রতি বিরক্তি অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলের কাড়াকাড়ির ওপর অশ্রদ্ধা এবং কতিপয়ের দ্বারা দেশশুদ্ধ মানুষকে শোষণের বিরোধিতা আজ আর কেবল বামপন্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুতঃ আজ সকলেই এর প্রতিবাদ করছে। এমন কি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে যে সকল রাজনৈতিক পার্টি মত্ত তারাও এই ক্ষমতার লড়াইকে প্রকাশ্যে নিন্দা করার ভান করেন। যে সব পার্টি ধনী শ্রেণীর পৃষ্ঠ পোষকতা লাভ করেন তাঁরাও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করেন। ছোট বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরাও নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেন। চারিদিক থেকেই, 'নীতি পরায়ণ হও,' 'নীতিপরায়ণ হও' ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নীতিপরায়ণতার মূল্য সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলা সকল রাজনীতিক ও জনসেবকদের মধ্যে একটা অবশ্য পালনীয় ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথাপি উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। আজ সর্বত্রই চলেছে জন্তু জগতের নীতি 'জোর যার মুলুক তার', ক্ষমতার লড়াই,

ব্যবসা বাণিজ্যের নামে ডাকাতি। সকল দেশেই এ সব অপরাধ কমবেশী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মিথ্যাবাদী না হয়ে কোন দেশের পক্ষেই এ বিষয়ে না বলার উপায় নেই।

এ সব সত্ত্বেও এটা লক্ষণীয় যে, সমাজ জীবনে নীতি পরায়ণত অভাবের প্রতি এই নিন্দাবাদ এবং নীতিপরায়ণতার প্রতি এই মৌখি আনুগত্যের সোচ্চার ঘোষণা। রাজনীতিকরা যে তাঁদের কথার স কাজের মিল রাখতে পারেন না, তার কারণ তাঁদের অসাধুতা হ'তেও পারে। তাঁরা এক দুষ্ট চক্রের কবলে পড়েছেন। যে খেল যে নিয়ম তা মেনেই খেলতে হয়। এই সব নীতিবাক্য প্রচারকা রাজনীতিকদের দোষ হল তাঁরা জানেন না যে, যতদিন পর্যন্ত রাজনীতি লক্ষ্য হবে ক্ষমতা দখল ততদিন তাঁদের নীতিবাগীশ হওয়া চলবে ন তাঁদের 'উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কোন উপায় গ্রহণের' নীতিই গ্র করতে হবে। একবার এই ঘুর্ণিপাকের মধ্যে পড়লে সেরা মানুষদের দুর্নীতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেরী হয় না ; তখন সে গহ্বরটা হয়ে দাঁড়ায় তার পরম কাম্য ক্ষমতার উচ্চতম শিখর রূপে।

সমসাময়িক জগতের সংকটাপন্ন অভিজ্ঞতা চিন্তাশীল মানুষকে আ ভাবিয়ে তুলেছে। যে সমাজ দর্শনের মূলনীতি থেকে বাম ও দক্ষি পন্থী, রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক, প্রতিক্রিয়াশীল ও বৈপ্লবি রাজনৈতিক মত সমূহের উদ্ভব হয়েছে তা পুনর্বিচার করতে বা করছে। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সব রাজনৈতি মতবাদের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই ; কেননা পথ সম্ব বিভিন্নতা থাকলেও এদের সকলের লক্ষ্যই হ'ল জনসাধারণের সার্বভৌ ক্ষমতা দখল। সুতরাং রাজনীতি ও সমাজ জীবনকে নীতিপরায়ণ কর

হলে এমন এক রাজনৈতিক দর্শন রচনা করতে হবে, যা জনসাধারণের হাত থেকে ক্ষমতা দখলকে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রচেষ্টার পূর্বসর্ত বলে মনে করবে না। এই নতুন রাজনৈতিক তত্ত্ব রচনা করা সম্ভব হবে যাতে ক'রে ব্যক্তির প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

নিজ নিজ বিবেকের নির্দেশেই যখন মানুষ নীতিপরায়ণ হয়, তখন একমাত্র ব্যক্তির নিজ চেস্টাতেই নীতিপরায়ণ হওয়া সম্ভব, এবং নীতিপরায়ণ মানুষ ছাড়া নীতি নিষ্ঠ সমাজ অসম্ভব। এতদিন নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য সমাজ-স্থপতিরা উল্টো-উপায়ে উর্ধপদ-অধঃমুণ্ড সমাজ গড়ে সমস্যা-সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। উদারনৈতিক লিবারেলরা বিশ্বাস করতেন, উত্তম আইনের দ্বারাই উত্তম জীবন গড়ে তোলা যাবে।* এইসব উদার-নৈতিকদের "সংস্কারবাদী" আখ্যা দিয়ে প্রথমে সমাজতন্ত্রীরা, পরে কমিউনিষ্টরা বললেন, মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করছে, সার্বজনীন মালিকানার ওপর ভিত্তি ক'রে অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার ওপর।†

*তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, মানুষকে যে পাত্রে রাখা যাবে সে সেই পাত্রেরই রূপ নেবে। জন্তু জগতে এ নিয়মটা খাটে বটে, কিন্তু মানুষের বেলা তা খাটে না। পরিবেশের সঙ্গে খাপখাওয়াতে সকল জীবই নিজেকে বদলায়; যথা বরফের দেশের জীব বরফ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে নিজের রং শাদা করে, নিজের গায়ে লোম গজায়; মরুভূমির জীব মরুভূমির উপযুক্ত হয়। কিন্তু মানুষ নিজেকে না বদলে নিজ বুদ্ধি বলে পরিবেশকে বদলে নিজের প্রয়োজনোপযোগী করে নেয়। (অনুবাদক)

†এ উভয় মতবাদই ব্যক্তি মানুষের সৃজনশীলতাকে স্বীকার না ক'রে মানুষকে পরিবেশের হাতের পুতুল করেছেন, মানুষকে কর্তৃকারক না ক'রে, করেছেন কর্মকারক। (অনুবাদক)

এর অনিবার্য ফল ফলেছে, উদারনীতিক ও সোস্যালিষ্ট-কমিউনিষ্টদের সমষ্টিবাদী মতবাদে ব ক্তিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছে। এইসব সমষ্টিবাদী সামাজিক দর্শনের যুক্তি থেকেই উদ্ভব ঘটেছে ফ্যাসিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্রীদের রাজনীতি।

ব্যক্তিকে সমাজ দর্শনের কেন্দ্রে স্থাপন করা কঠিন নয়। প্রকৃত পক্ষে উদারনৈতিক সমাজদর্শন ও রাজনৈতিক তত্ত্বের মূল নীতি ছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ। আধুনিক সভ্যতার বিরাট কীর্তি সমূহের প্রেরণার উৎস ছিল উদারনীতি—লিবারেলিজম। কিন্তু কার্যতঃ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এক অবাস্তব আদর্শে পর্যবসিত হয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার ব্যক্তি মানুষের, একথা সংবিধানের পাতাতেই লেখা থেকে যাচ্ছে। লিবারেল দর্শনের অবক্ষয়ের ফলেই বিভিন্ন সমষ্টিবাদী মতের উদ্ভব হয়। এ সব সমষ্টিবাদী মতবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়, অবাস্তব শূন্যগর্ভ আদর্শ বলে উপহাস করা হয়; বলা হয়, স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যক্তি মানুষকে নিজ সুখ দুঃখ ভুলে সমষ্টি সত্তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে। অন্য কথায়, আত্মহত্যা করেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে। উদারনীতি ব্যক্তির সার্বভৌমত্বকে সংবিধানে লিখে রেখেই ক্ষান্ত হয়েছে, আর সোস্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের বক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা এক প্রকাণ্ড ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়।

উদারনৈতিক সমাজদর্শনের অবক্ষয়ের কারণ, নৈতিকতার প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে অস্পষ্টতা। এই উৎস সম্বন্ধে এই দর্শনের ধারণার প্রথম দিকটা ভালই। মানুষ নৈতিক সত্তা বিশিষ্ট জীব, অতএব সার্বভৌমত্বের অধিকারী হবার যোগ্যতা তার আছে। এটা এক প্রাচীন বিশ্বাস।

ক্রীশ্চানরা ইউরোপে এই মত প্রচার করে। মানুষ যে নৈতিক সত্তা-বিশিষ্ট জীব তার কারণ তার মধ্যে আত্মা বিদ্যমান। আর এই আত্মা বিশ্ব আত্মারই অংশ। গোড়ার দিকে এই চিন্তাধারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই ইউরোপের মানুষ মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যাবস্থার অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক সংগঠন সমূহের দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু মানুষের নীতি-পরায়ণতার প্রেরণা ধর্ম্মবিশ্বাসের দ্বারা নির্ধারিত হওয়ায় তার সার্বভৌমত্ব সীমিত ও খণ্ডিত হয়। এর ফলে মানুষের বন্ধন দশা আর ঘোচে না। এর অর্থ দাঁড়াল এই. মানুষ নিজের চেষ্টায় নীতিপরায়ণ হতে পারে না। সুতরাং এক অপার্থিব শক্তির দ্বারা চালিত হয়েই তাকে চলতে হবে। এই রকম আধ্যাত্মিক অধীনতা যদি মানুষকে পঙ্গু করে রাখে, তবে কোন দিনই সে মুক্ত স্বাধীন সত্তা লাভ করতে পারবে না। আধুনিক সভ্যতার গোড়ার দিককার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই আত্মিক চির অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সে সংগ্রাম থেকেই উদারনৈতিক দর্শনের উদ্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দর্শন উন্নতির চরম শিখরে ওঠে। বিদগ্ধ যুগে (The Enlightenment) এই দর্শনের পূর্ণ বিকশিত রূপ দেখা গিয়েছিল।

ফরাসী বিপ্লবের অমিতাচারের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার ফলে উদারনৈতিক দর্শন আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে যায়: প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত নৈতিক জীবনের পরিবর্তে পারলৌকিক প্রভাবে প্রভাবিত নৈতিক ব্যবস্থা পুনঃ-প্রচলিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের এই পারলৌকিকবাদী নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে উদারনৈতিক সমাজ সংস্কারকগণ ও তাত্ত্বিক রাজনীতিকরা নীতিশাস্ত্রের হিতবাদী ব্যাখ্যা—'অধিকাংশের অধিকতম

সুখ' নীতির প্রবর্তন করেন। প্রথমোক্ত পারলৌকিকবাদী নীতিশাস্ত্রে যদি নৈতিক মূল্যমান গুলিকে মানবীয় অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ে পরিণত করা হয়ে থাকে, * তবে শেষোক্ত হিতবাদ মানুষকে সর্বজনগ্রাহ্য কোন নৈতিক অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকে বঞ্চিত করেছে। আর সমাজে সর্বজনগ্রাহ্য (objective standard) কোন মূল্যমান না থাকার অর্থ হল সমাজে নীতিহীনতা। † এই দুই নীতি তত্ত্বের মধ্যে পড়ে সভ্য জগত আজ এক প্রচণ্ড নৈতিক বিশৃঙ্খলার আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে।

এই সঙ্গে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিনিধি মারফৎ শাসন, আর নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতা মূলক অর্থনীতিতে শক্তিমানকে আরো শক্তিশালী আর দুর্বলকে আরো দুর্বল করার ফলে ব্যক্তিকে একান্তভাবেই অসহায় করে ফেলে। একদিকে সমাজে যখন সর্বজন-গ্রাহ্য কোন নৈতিক অনুশাসন নেই, যার জন্য সমাজে, নিজ নিজ সুবিধা-বাদী নীতি অনুসারে চলার ফলে, কারুকেই আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, আর একদিকে সমাজে ও রাজনীতিতে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত

*অর্থাৎ এই সব ধর্মীয় আচার-আচরণ মেনে চললে ইহ জীবনে তার সুফল না ফলতেও পারে, যদি না ফলে তবে পরকালে তা ফলবে, এই বিশ্বাস।
(অনুবাদক)

†মার্কসবাদীরাও হিতবাদী। "অধিকাংশের অধিকতম সুখ" নীতি অনুসারেই মার্কসবাদীদের শ্রেণী হিতবাদ নীতি। সেই জন্য শ্রেণী বহির্ভূত মানুষকে হত্যা করতেও তাঁদের বাধে না; সেই জন্যেই তাঁরা বলতে পারেন expropriators should be expropriated—চোরের ওপর বাটপাড়িতে দোষ নেই। সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসনে, objective moral standard অনুসারে, চুরি সর্বক্ষেত্রেই দোষ, হত্যা সর্বক্ষেত্রেই অপরাধ। অতএব হত্যাকারীকে হত্যা, চোরের ওপর বাটপাড়ি করা যায় না। (অনুবাদক)

অসংগঠিত একক মানুষকে যখন ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের শিকার হয়ে চলতে হচ্ছে তখন, এই দুইয়ে মিলে, মানুষ দিশেহারা হয়ে নিজের ওপর একেবারেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। অধিকাংশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমনই অভিজ্ঞতা হতে থাকে যে, সমষ্টি সত্তায় বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টরা যে ব্যক্তি স্বাধীনতার আদর্শকে উপহাস করে থাকে তাকেই যথার্থ বলে মনে করে। সমষ্টিবাদী সমাজ দর্শনে যে বলা হয়, জনতার সম্মিলিত শক্তির মধ্যেই ব্যক্তির নিরাপত্তা নিহিত, মানুষ নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে এই সমষ্টিবাদী মতবাদ গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হতে চায়। ফলে রাজনীতি থেকে ব্যক্তি মানুষের অন্তর্ধান ঘটে। জনতার ভাবাবেগকে জাগিয়ে তুলে, তাদের কাম-ক্রোধাদি রিপুকে উত্তেজিত ক'রে নিজেদের কার্য সিদ্ধি করাই তখন রাজনীতির সারতত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায়।

এটা আজ অতি পরিষ্কার হয়ে গেছে, সামাজিক রীতিনীতি ও রাজনৈতিক কাজকর্মের ওপর নীতিতত্ত্বকে যদি সুস্থ প্রভাব বিস্তার করতে হয় তা হলে তাকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে হবে। সুতরাং প্রধান প্রশ্ন হল: নীতিতত্ত্বের ভিত্তি কি? মানুষ কি নিজ শক্তি বলে নীতিপরায়ণ হতে পারে? এ যাবৎ প্রচলিত ধারণা চলে আসছে, মানুষ একমাত্র সামাজিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার দ্বারাই অর্থাৎ পুলিশের ভয়ে বা লোক লজ্জায় কিংবা স্বর্গের লোভে বা নরকের ভয়ে নীতি পরায়ণ থাকতে পারে। নীতিপরায়ণতার উৎস সম্পর্কে এই যে ধারণা তা "মানুষ একটি নৈতিক সত্তা বিশিষ্ট জীব" এই প্রাচীন বিশ্বাসকে বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু এই প্রাচীন বিশ্বাসকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে এবং এই বিশ্বাসের

মূলে যে ত্রুটি ছিল তা থেকে একে মুক্ত করতে হবে। তবেই প্রকৃত বৈপ্লবিক সমাজ দর্শন রচনা করা সম্ভব হবে এবং তার থেকে এক যুক্তি-সম্মত রাজনৈতিক তত্ত্ব ও নীতিপরায়ণ রাজনীতি গড়ে তোলা যাবে।

আধুনিক সভ্যতার প্রথম কয়েক শতাব্দীতে চিন্তাজগতের অগ্রদূতরা মানব-প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জগতে মানুষের স্থান সম্পর্কে কতকগুলি লোকায়ত ধারণা তুলে ধরে একটা বড় পদক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের সেই বলিষ্ঠ চিন্তাধারাই প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে ক্রমঃবর্ধমান জ্ঞানের দ্বারা পুষ্ট হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদে পরিণতি লাভ করে। তাঁদের দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল মানবিক। তাঁদের মত ছিল, মানুষ ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি নয়, অন্যান্য জীবের মত প্রাকৃতিক নিয়মেই তার সৃষ্টি। নিয়মনিয়ন্ত্রিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য থেকেই মানুষের উদ্ভব; তাই মানুষের দেহ যন্ত্রও নিয়ম নিয়ন্ত্রিত, এবং একই নিয়মে তার চিন্তা যন্ত্রের প্রক্রিয়াও চলে। এই নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত চিন্তা কার্যকেই যুক্তি-পরায়ণতা বলে। (অর্থাৎ কার্য-কারণ নিয়ম অনুসারে মানুষও চিন্তা করে, সেইজন্য মানুষও যুক্তিপরায়ণ জীব

*প্রকৃতির জড় ও জীব জগৎ সকলেই এই কার্য-কারণ নিয়মেই চলে। ইঁট কাঠ পাথর, পোকামাকড় ইঁদুর আরশুলা কার্যকারণ নিয়মেই চলে। সেই জন্যই ইট কাঠ পাথর, পোকামাকড় ইঁদুর আরশুলা নিজ নিজ গুণাবলী রক্ষা করে চলতে সমর্থ হয়। ইঁট কাঠ পাথর দিয়ে বাড়ী ঘরদোর গড়া সম্ভব হয়, কীটনাশক ওষুধ দিয়ে দেশকাল পাত্র নির্বিশেষে পোকামাকড় ইঁদুর আরশুলাকে মারা সম্ভব হয়। ইঁদুর-আরশুলার মস্তিষ্ক অপেক্ষা মানুষের মস্তিষ্কের গুণ অনেক বেশী, সেই জন্য মানুষের যুক্তিপরায়ণতার মূল্যমানও অধিক।

(অনুবাদক)

এই যুক্তিপরায়ণতা থেকেই মানুষ নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যেই আদিম সমাজ গড়ে তুলেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর জীববিজ্ঞানের বৈপ্লবিক আবিষ্কার সমূহ পূর্ববর্তী চিন্তা-নায়কদের গবেষণামূলক সম্ভাব্য সূত্র ও যুক্তিসঙ্গত অনুমান সমূহের মধ্যে যে যথেষ্ট সত্য ছিল তা প্রমাণ করেছে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই উদার-নৈতিক দর্শনের দ্ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা সভ্য জগতকে নৈতিক বিশৃঙ্খলার দিকে হাল ভাঙ্গা তরীর মতই ভাসিয়ে দেয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে। এই সময়ে পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে বস্তুর সঙ্গে কার্য-কারণ নিয়মের সম্বন্ধ সম্পর্কে পুরাতন ধারণার বিরোধ দেখা দেয়, তার ফলে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদের ভিত্তিও ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই এক নয়া-রহস্যবাদ (নিও মিষ্টিসিজম) গড়ে ওঠে। তাঁরা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়েই মানবতাবাদের আদর্শ ও অঙ্গীকারকে অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব বলে ঘোষণা করেন।* তাঁরা ব্যক্তি নিরপেক্ষ

*পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার প্রথম যুগে যখন ধরা পড়ে, ইলেকট্রনের ব্যবহারের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, তখন কিছু বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, কার্য-কারণ নিয়মের নির্দেশ্যবাদ যখন এই নিখিল বিশ্বের মূলাধারে নেই, তখন এই বিশ্বের মূল সত্য অজ্ঞেয়—অবাঙ্‌মনসোগোচরম্। কিন্তু গড়-পড়তার নিয়ম ও সম্ভাবনার নিয়ম দিয়ে পারমাণবিক জগতকে দেখলে দেখা যায়, সেখানেও কার্য-কারণ নিয়ম ঠিকই কাজ করে। ইলেকট্রনের ব্যবহার অনিয়মিত হলেও ইলেকট্রণ সমষ্টি রচিত পেণ্ডুলাম ঠিক সময় রেখেই দোলে, চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ঠিক নিয়ম মেনেই চলে, এটম বোমা ঠিকই ফাটে, এটমিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়, আইসোটোপ দিয়ে চিকিৎসা কার্য নিশ্চিন্ত বিশ্বাসেই করা চলে। এ সম্পর্কে M. N. Roy রচিত *Heresies of the* **20th Century** দ্রষ্টব্য। (অনুবাদক)

বাস্তব জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, এমন কি মানুষের কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার ক্ষমতা সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) ওপর অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বিশ্বতত্ত্বকে ও সৃষ্টিতত্ত্বকে (Cosmology ও Ontology) তাঁরা ভুলেছেন এবং তার ফলে চিন্তার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। চিন্তা জগতের এই সংকট নৈতিক জগতের সংকটকে আরো ঘোরালো করে তুলেছে।

বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মনোবিজ্ঞানও অযুক্তিবাদ প্রচার স্বরু করে। নীতিতত্ত্বে অন্তরবাণীর (intuition) ছদ্মবেশে মিষ্টিকবাদ ও অলৌকিক-বাদের পুনরাবির্ভাব ঘটে। মানুষ অযুক্তিপরায়ণ জীব, রিপুসমূহের অন্ধ আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে চলাই তার সহজাত প্রেরণা। সুতরাং কী ব্যক্তি জীবনে, কী সমাজ জীবনে নীতিপরায়ণতার একমাত্র প্রেরণা হচ্ছে দণ্ডবিধি ও পুলিশ, কিংবা নরকের ভয় দেখাবার জন্য পুরোহিত। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এই সব লৌকিক ও ধর্মীয় রক্ষাকর্তাদের সজাগদৃষ্টি সামান্যতম শিথিল হলেই সুরু হবে জঙ্গলের-জোর-যার-মুল্লুক-তার নীতির তাণ্ডব নৃত্য। এতসব সত্ত্বেও, অদৃষ্টের এমনই নির্মম পরিহাস যে, এই সব রক্ষাকর্তাদের সদাসতর্ক দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও সমাজে আজ জন্তু জগতের নীতিই অপ্রতিহত শক্তিতে রাজত্ব করছে।

এই দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধার পেতে হলে এমন একটি নীতিতত্ত্বের প্রয়োজন যার প্রেরণা আসবে মানুষের যুক্তিপরায়ণতা থেকে। কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে, কার প্রেরণায় মানুষ যুক্তিপরায়ণ হয়? যুক্তি বলতে কি বোঝায়? যুক্তি কি কোন অলৌকিক দৈববাণী স্বরূপ কিংবা

মানুষেরই মস্তিষ্কের কার্য ? যুক্তি যদি দৈববাণী মাত্রই হয় তবে যুক্তিকে নীতিতত্ত্বের প্রেরণার উৎস বলা চলবে না। তখন আরো নতুন প্রশ্ন উঠবে। এক সমস্যা সমাধান কবতে অন্য সমস্যা তোলার সামিল হবে। যুক্তি যে ইহলৌকিক এবং মানুষেবই দৈহিক ক্রিয়া বিশেষ তা প্রকৃতি থেকেই প্রমাণ হবে। প্রকৃতির কার্যকারণ নিয়মকে প্রকৃতির যুক্তি বলা চলে। তেমনি মানুষের মস্তিষ্ক নামক দেহযন্ত্রের ক্রিয়া স্বরূপ যে চিন্তা তা এই কার্য-কারণ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ঘটে বলে মানুষকেও যুক্তিপরায়ণ জীব বলি। নইলে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্বসূরীদের প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্র ও তার নৈতিক ভিত্তির ধারণা, যে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। পূর্বসূরীদের এ সব ধারণা সেদিন চিন্তা ক্ষেত্রে অনুমান মাত্র ছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তী যুগে পদার্থ ও জৈব বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমূহের দ্বারা সেই সব অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ শিবিরের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সমসাময়িক জগতের বাস্তব সমস্যাগুলির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা। বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে নীতিতত্ত্বের সঙ্গে সমাজদর্শন ও রাজনীতির সমন্বয় সাধন। সকল বৈপ্লবিক সমাজ দর্শনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠা করা। এবং ব্যক্তির যদি নীতিপরায়ণ হবার মত অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে তবেই ব্যক্তি সমাজে অপর মানুষের ক্ষতি না করে নিজের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। মানুষ যে নীতিপরায়ণ সত্তা এ বিশ্বাস বহুযুগের। কিন্তু এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি ব্যক্তি মানুষকে বিশ্বাস ক'রে সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নি। এখন সেই বিশ্বাস মাত্রকে বাস্তব সত্য রূপে গ্রহণ করতে হবে। সত্যটি হচ্ছে, মানুষ-

নীতিপরায়ণ সত্তা, কারণ সে যুক্তিপরায়ণ। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত কার্য-কারণ নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলেছে। নীতিপরায়ণতার অপর নাম সর্ববিষয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা। নীতিপরায়ণতাই মনুষ্য সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলে। কার্যকারণ নিয়ম অনুসারে চিন্তার সাহায্যেই মানুষ অপর মানুষের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রে সমাজকে ভারসাম্যে অচঞ্চল রাখার জন্য সর্বজনমান্য নৈতিক অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করেছে, এবং নিয়ম নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির মধ্যে মানুষ উদ্ভূত হয়েছে বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে।

সমাজ দর্শনকে নীতি-তত্ত্বের ভিত্তির ওপর দাঁড় করানই বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। পারলৌকিকতার চোরা-বালি এবং ব্যক্তি বিশেষের খুসিমত আপেক্ষিক নীতিতত্ত্বের চোরাগর্ত এড়াতে হলে নীতি-তত্ত্বকে সাধারণ দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত ধারণা মিশিয়ে আকাশ কুসুমোদ্যান রচনা করতে চাই না, তা হলে সমালোচনার নাম মাত্র ঝড় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা মিলিয়ে যাবে। মানবতন্ত্রী নীতিতত্ত্ব রচনা হতে পারে একমাত্র কার্য-কারণ নিয়মে পরিচালিত যান্ত্রিক বিশ্ব-তত্ত্ব (Mechanistic Cosmology) এবং বস্তু ও মানুষের মনের সমন্বয়ে গঠিত যে ফিজিক্যাল রিয়ালিস্ট সৃষ্টিতত্ত্ব, (Physical Realist Ontology) তারই ভিত্তির ওপর*।

*মার্কসের ডায়লেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজমের সঙ্গে রায়ের ফিজিক্যাল রিয়ালিজমের পার্থক্য হ'ল যে, উভয়েই বস্তুবাদী, কিন্তু মার্কসের বস্তুবাদ দ্বান্দ্বিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত ; আর রায়ের বস্তুবাদ চলে যান্ত্রিক সৃষ্টি-তত্ত্ব অনুসারে মার্কসের বস্তু প্রথমে মানুষের ওপর ক্রিয়া জানাবার পর মানুষ প্রতিক্রিয়া জানায় নতুবা মানুষ নিষ্ক্রিয়। এটাই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। আর রায়ের মানুষ চলে যান্ত্রিক

সুতরাং আধুনিক পদার্থবিদ্যার সমস্যাগুলি নিয়েই আমাদের আলোচনা সুরু করতে হবে। আলোচনার পরবর্তী ধাপে অজৈব বস্তু জগতের সঙ্গে জৈব জগতের যোগসূত্র খুঁজে বের করতে হবে। এই যোগ সূত্রকে আর হারিয়ে যাওয়া সূত্র বলা চলে না—এই যোগ সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার ফলে আদি জীব জন্মের সমস্যার সন্ধান লাভ সম্ভব হয়েছে।* যদি আমরা আবিষ্কার করে থাকি যে প্রকৃতির মধ্যে কার্যকারণ নিয়মের সূত্র ধরেই জীব জন্মের উদ্ভব তা হলে মানুষের যুক্তিশীলতাও যে এই বিশ্বের ঐ একই কার্য-কারণ নিয়মের সূত্র ধরেই উদ্ভূত হয়েছে তা অবশ্যই বলা চলে, এবং এই সঙ্গেই পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের কাল্পনিক ব্যবধান দূর হয়ে যাবে। দর্শনের কঠিনতম সমস্যা যে জ্ঞান-

---

সৃষ্টি তত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী। কার্য-কারণ নিয়মের পথ বেয়ে নির্জীব প্রকৃতি থেকেই জীব জগতের সৃষ্টি হয়েছে। কার্য-কারণ নিয়মের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জীব জগতের ক্রমঃ বিকাশের ফলে মানুষ অপূর্ব ও অতুলনীয় মানসিক শক্তির অধিকারী হয়ে উদ্ভূত হয়েছে এবং এই মস্তিষ্কের ক্রমঃ বিকাশের ধারাও মানুষের অধঃস্তন জীব গোষ্ঠীর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। বাইরের কোন প্রকার ক্রিয়া বা উদ্দীপনা ব্যতিরেকেই মানুষের মন ক্রিয়া করতে পারে, কল্পনা করতে পারে। অতীতের শত সহস্র অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে-মিশিয়ে কেটে-ছেটে এক নতুন পরিকল্পনা করতে পারে, নতুন ভাব ও ভাবনার জন্ম দিতে পারে এবং তাকে রূপ দিতেও পারে। মানুষের এই ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ নতুন আইডিয়া অনুসারে বিপ্লব ঘটাতে পারে, সভ্যতাকে নতুন পর্যায়ে তুলে ধরতে পারে। মনের এই গুণকে গুরুত্ব দেবার জন্য এবং মার্কসের ডায়লেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজমের থেকে পৃথক করার জন্য রায় নিজের বস্তুবাদকে Physical Realism বলেছেন। (অনুবাদক)

*বিভিন্ন অজৈব পদার্থের সংমিশ্রণে আদিমজীব কণিকা এমিনো এসিড্ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে, এবং প্রোটিন কাণিকা প্রস্তুত করাও যে সম্ভব তা প্রমাণিত হয়েছে। (অনুবাদক)

তত্ত্বের সমস্যা তারও সমাধান হয়ে যাবে। সত্য বলতে তখন আর কোন আধ্যাত্মিক প্রত্যয়কে বুঝাবে না, বুঝাবে জ্ঞানের বিষয় বস্তুকে। সত্যের এই ব্যাখ্যার দ্বারা অন্যান্য মূল্য ও গুণের প্রকৃত স্বরূপও ধরা পড়বে এবং মূল্য ও গুণ সমূহকে তখন মান অনুসারে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া সম্ভব হবে। যে জগত ও সমাজে মানুষ জন্মেছে এবং বিকশিত হয়ে উঠছে সেই জগত, সমাজ ও ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের নৈতিক মূল্যমানগুলি গৃহীত হয়েছে বলে এক ব্যাপক সমাজ দর্শনের সঙ্গে এই নীতি-তত্ত্বের সমন্বয় ঘটান সম্ভব হয়েছে ; এবং এই সমাজ দর্শনের সাহায্যেই সমসাময়িক জগত যে সকল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা সমাধানের জন্য এক মানবতাবাদী পথ নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

নতুন সমাজ দর্শনের ভিত্তি

[১৯৫১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ১ম নিখিল ভারত র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট সম্মেলনে রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক বিবৃতি সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতা]

এ সম্মেলনে জন সাধারণের বিবেচনার জন্য যে দুটি বিবৃতি পেশ করা হয়েছে তাতে যে চিন্তাধারা রূপায়িত হয়েছে, খুব সম্ভব, এর পূর্বেও কেউ কেউ তা ব্যক্ত করে থাকবেন। কাজেই এর জন্য কোন স্বত্ব দাবী করা হচ্ছে না। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে এগুলো বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা আজ পর্যন্ত কোথাও হয়নি। এ সব মত আগে যাঁরা পোষণ বা প্রচার করেছেন, তাঁদের প্রতি কোন বিরূপ কাটাক্ষপাত করার উদ্দেশ্যে এ কথাটা বলা হচ্ছে না। এ সব চিন্তাধারা রূপায়িত করার ব্যর্থতার জন্য দায়ী হচ্ছে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণাই স্মরণাতীত কাল থেকে সমাজ দর্শনের ধারণাগুলিকে বিকৃত করে রেখেছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আচরণ সমাজ সম্পর্কেরই বিভিন্ন রূপ মাত্র। শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এ গুলো ব্যক্তি সমূহের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সমাজ বিজ্ঞানের মূল বিষয় হচ্ছে ব্যক্তি। সুতরাং মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নির্ণয় করেই আমাদের যাত্রা সুরু করতে হবে; তখন দেখা যাবে, সামাজিক আচরণের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন এনে দেবে যা বর্তমান নৈরাশ্যজনক অসহায় পরিস্থিতি থেকে আমাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

পূর্ববর্তী বক্তাগণ উল্লেখ করেছেন, বর্তমান বিবৃতি দুটিতে আমাদের দেশের সবচেয়ে জরুরি সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য এক নতুন পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক ব্যাপক জীবন দর্শনের উৎস থেকে এই দুটি বিবৃতি রচিত। এই দর্শনের মূলতত্ত্ব হল, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা। মনুষ্য প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান একেবারে নতুন নয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে যে একটা ব্যাপক সমাজ-দর্শন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সুরু হয় তখন থেকেই এই প্রচেষ্টার পথিকৃৎরা মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু অনুমান রচনা করেন। এই অনুমানের মধ্যে অনেক রকমের তারতম্য থাকলেও প্রধানতঃ তা দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম ধারণা হ'ল : মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর এবং নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করাটাই তার প্রকৃতিগত স্বভাব। দ্বিতীয় ধারণা হল : দয়ালু এক অতিপ্রাকৃত মহাশক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন মানুষের প্রকৃতিগত প্রথম ধারণাটি দ্বিতীয় ধারণার বিপরীত হলেও দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক দিক থেকে মানুষের আদিম পাপ সম্পর্কে খৃষ্টীয় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ মানুষ স্বভাবতঃই পাপী (মন্দ), কিন্তু পরমপিতা ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত মহাশক্তির নিকট নতি স্বীকার করলে সেই পুণ্যবলে তার পক্ষে ভাল হওয়া সম্ভব।

মনুষ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে এই যে দুটি মূল ধারণা তার যে কোন একটির ওপর নির্ভর করে যদি কোন সমাজদর্শন গড়ে তুলতে হয় তবে সমাজকে দমন-পীড়নের যন্ত্র হিসাবেই গড়ে তুলতে হবে ; সে যন্ত্র মানুষের তৈরি আইন-কানুন দিয়েই পরিচালিত হোক বা ঈশ্বর প্রেরিত অনুশাসনের দ্বারাই শাসিত হোক। উভয়ের উদ্দেশ্যই হ'ল মানুষের কুপ্রবৃত্তি সমূহকে দমন করা। উভয় ক্ষেত্রেই সমাজকে হতে হয় কারাগার—ত

সে দণ্ডশালা রূপেই হোক বা সংশোধনাগার রূপেই হোক। একটিতে ব্যক্তি মানুষ তার জন্মগত অধিকার স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের নিকট বিসর্জন দেয়, অপরটিতে তাকে বিশ্বাস করতে হয়, তার ইহলৌকিক জীবন ঐশ্বরিক বিধান বা কোন অতিপ্রাকৃত মহাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু এই ঈশ্বর বা মহাশক্তিকে সে কোনদিন জানতে পারবে না—কারণ তা অজ্ঞেয়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি মানুষ একান্তই অসহায়; সামাজিক সম্পর্কে তার কোন স্বাধীনতা নেই, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কাজকর্মে তার কোন কর্তৃকারকত্ব নেই—উদ্যোগ গ্রহণের কোন অবকাশ নেই।

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে এই দুই ধারণা থাকায় এমন কোন সমাজ দর্শন উদ্ভাবিত হল না, যার সাহায্যে এক রাজনৈতিক মতবাদ ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব রচনা ক'রে মানুষের সাম্য স্বাধীনতাকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হয়। তারই অনিবার্য পরিণতি হয়েছে আধুনিক সভ্যতার এই সংকট। সকলের মুখ থেকেই আজ শোনা যায় সভ্যতার সংকট। এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থও লেখা হয়েছে। এ কালের প্রায় সকল মণীষীই এই সংকটের প্রকৃতি জানবার চেষ্টা করছেন এবং এর কারণের অনুসন্ধানও করছেন। কিন্তু সংকট সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণার অভাবে এই সব সদিচ্ছাপূর্ণ ও প্রায়শঃ যোগ্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। একদল বলেন, এটা অর্থনৈতিক সংকট, যদিও এঁদের মধ্যে সবাই অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু এই মত যদি মেনে নেওয়া হয় যে, মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর জীব এবং তার অর্থনৈতিক তৎপরতার মূলে আছে কেবল স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণা, তবে তাতে যুক্তির দিক থেকে অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদকেই মেনে নেওয়া হয়। কার্লমার্কস ইতিহাসের

এই অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যাকে সমাজ দর্শনের স্তরে উন্নীত করেন। কোন কোন সমসাময়িক দার্শনিক মার্কস অপেক্ষা বেশী বিজ্ঞতার ভান ক'রে ইতিহাসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যাকে নিন্দা করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত মার্কসের অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই। আধুনিক উদারনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে অর্থনৈতিক মানুষ— ইকনমিক ম্যানের তত্ত্ব আজও পরিত্যক্ত হয়নি। মানুষ যদি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সত্তা বিশিষ্ট জীব হয়, তবে ভোগ্য বস্তুর লাভালাভের মাপকাঠি দিয়েই সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলবে।*

অনুমানের বিষয় যদি এই হয়, তা হলে আধুনিক সভ্যতার সংকটকে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সংকটই বলতে হয়। তা হলে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করলেই, পুরাতন ধনতান্ত্রিক

---

* সভ্যতার আদিকাল থেকে রাজনীতি ছিল একমাত্রিক। মানুষের অন্নবস্ত্রাদির অভাব মেটানটাই ছিল সুশাসনের প্রমাণ। অর্থাৎ জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া না-পাওয়ার ওপরই রাষ্ট্রের ভাল-মন্দের বিচার হত। সর্দারতন্ত্র, পুরোহিত তন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, একানায়ক-তন্ত্র, সমাজতন্ত্র সবই মানুষকে এই অর্থনৈতিক মানুষ (economic man) রূপেই দেখে এসেছে।

এই একমাত্রিক রাজনীতির মধ্যে আর একমাত্রা যোগ করলেন মানবেন্দ্রনাথ। তিনি বললেন, মানুষ কেবল মাত্র অর্থনৈতিক মানুষ নয়। খেয়ে-পরে শুধু মাত্র টিকে থাকলেই মানুষের চলে না। তার অন্তর্নিহিত সকল বৃত্তি ও শক্তিকে অনুশীলিত ও বিকশিত করে পছন্দমত জীবনকে সম্ভোগ করতে পারার সুযোগ সুবিধাও তার চাই। ব্যক্তিত্বের এই বিকাশ সম্ভব হয় না যতক্ষণ না মানুষ নিজ নিজ সমস্যা সমাধান করার দায়-দায়িত্ব লাভ করছে। এযাবৎ শাসক শ্রেণীই দেশের সকল সমস্যার জন্য মাথা ঘামিয়ে এসেছেন এবং সাধারণ মানুষের ওপর প্রভুত্ব করার জন্য ব্যক্তি মানুষকে নাবালক, অশিক্ষিত, অক্ষম, অযোগ্য, অনধিকারী করে রেখে তাদের সমস্যা সমাধানের কোন দায়-দায়িত্বই দেয় নি।

ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলেই এই সংকটের অবসান ঘটবে। এই দৃষ্টিকোন থেকে এক নতুন সমাজ দর্শন গড়ে তোলার চেষ্টা আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং এ প্রচেষ্টা কেবল বৈপ্লবিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সাবধানী ও রক্ষণশীল অর্থনীতিকরাও অনুরূপ চেষ্টায় রত আছেন। খুব কম লোকই আছেন যাঁরা বর্তমান অর্থনৈতিক তত্ত্বকে সংশোধন ক'রে সেই ভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করার প্রয়োজন অনুভব করেন না। যাঁরা অর্থনীতির বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের বিরোধী, তাঁরা তথাকথিত মিশ্র অর্থনীতিকেই বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় বলে নির্দেশ করে থাকেন। মিশ্র অর্থনীতির প্রকৃত তাৎপর্য কী এবং তা কতদূর বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, সে সম্বন্ধে পূর্ববর্তী বক্তাদের মধ্যে একজন বলেছেন।

আর দায়-দায়িত্ব না চাপলে কোন মানুষেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না বলে পৃথিবীর কোথাও সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশও সম্ভব হয়নি। ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ অপরিণতমনা বৃহদাকার শিশুমাত্র থেকে যায়, অন্যদিকে তেমনি শাসক শ্রেণী দেশ শুদ্ধ অপরিণতমনা নাবালেকদের গার্জেন সেজে রাজত্ব করতে থাকেন। যে সব রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের জন্য একটু ভাল খাওয়া-পরাব ব্যবস্থা করতে পারে, সেখানের মানুষেরা সুপুষ্ট জীবমাত্র হয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন ক'রে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

মানবেন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষকে স্থানীয় গণসভায় এনে, তাদের সার্বভৌমক্ষমতা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহারের দায়দায়িত্ব ঘাডে চাপাবার ব্যবস্থা ক'রে, ব্যক্তি মানুষকে পরিণতবুদ্ধি ও তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায় করলেন। ফলে সকল মানুষের সম্মুখে সীমাহীন সম্ভাবনার পথ খুলে গেল। ব্যক্তিমানুষের সমবেত প্রচেষ্টায় শুধু অন্নবস্ত্রাদি সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থাই হল না, জীবনকে ইচ্ছামত বিকশিত ও সম্ভোগ করার ব্যবস্থাও হ'ল। রাজনীতি দ্বি মাত্রিক হ'ল। এক মাত্রা হল জীবধর্মী, অন্য মাত্রা হল মনুষ্যধর্মী। একের মূল্য অস্তিত্ব রক্ষা, অপরের মূল্য অস্তিত্বের বিকাশ।

সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিষ্টদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনেক বেশী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তার সমর্থনে শক্তিশালী গণ-আন্দোলনও গড়ে উঠেছে। ত্রিশ বছরের ওপর হয়ে গেল একটি দেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়ে কমিউনিষ্ট আদর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সুরু হয়েছে। পরে আরো কয়েকটি দেশে এই কাজ সুরু হয়। সম্প্রতি এশিয়ার বৃহত্তম দেশটি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ফলে অর্থনীতির বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের ফলে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব কিনা সে বিচার করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে। তা যে হয়নি, তা সর্বজন স্বীকৃত। এমন কি কমিউনিজমের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শ আছে তাও প্রতারণামূলক ও সন্দেহজনক। রুশিয়াতে কৃষিশিল্প জাত দ্রব্যের উৎপাদন যে বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নতুন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে খুব অল্প দিন মাত্র এই কাজ সুরু হয়েছে বলে এই সময়স্বল্পতাকে হয়তো তাদের অক্ষমতার কারণ বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমিও উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি সত্ত্বেও চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। এর অর্থ হল, এই নতুন আর্থিক ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি টুকু পর্যন্ত ঘটাতে পারে নি। যদি ধরেও নেওয়া যায়, সেখানে উন্নতির পথে অনেকটা অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, তবে মাত্র এই টুকুর জন্য যে ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হয়েছে তা ভোলা যাবে না। সে মূল্য হচ্ছে রাজনৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্ব। রুশিয়ার এই অভিজ্ঞতা শুধু জীবধর্মী অর্থনৈতিক-মানুষের ধারণার তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ দর্শনের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিয়ে দিয়েছে।

যখনই কোন সরকার, তা একনায়কতন্ত্রীই হোক আর

পার্লামেণ্টারি গণতান্ত্রিকই হোক, নিজেকে জন কল্যাণের অছি বলে দাবী করে ; আর জন সাধারণ চায় তাদের জন্য সরকারই সব করে দিক, তখন এই সমস্যা সঙ্কুল আর্থিক নিরাপত্তা ও সংশয় মূলক পার্থিব কল্যাণের জন্য এরূপ অত্যধিক মূল্যই দিতে হয়। এই অবস্থায়, ইচ্ছামত কাজ করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতার দাবী যে কোন সরকারই করতে পারে। জনসাধারণ যদি উদ্যোগী হয়ে নিজেরা কিছু করতে না পারে, তবে কার্যতঃ কিংবা আইন অনুসারে গঠিত এক-নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা হরণ, হুকুম অনুসারে চিন্তা করতে বাধ্য হওয়া প্রভৃতি অবস্থা সমাজে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই এসে যায়। ফলে সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ; এক দিকে থাকে জনসাধারণ, আর অন্য দিকে থাকে শাসক গোষ্ঠী। এই শাসক গোষ্ঠী সামন্ত তান্ত্রিক, ধনী, সর্বহারা বা যে কোন শ্রেণীর অন্তর্গতই হোক জনগণ শাসিত হয়েই চলে, তাদের স্বাধীনতা বলতে আর কিছু থাকে না।

এমন লোক আছেন যাঁরা বলেন তাঁরা অর্থ নৈতিক নির্দেশ্যবাদ স্বীকার করেন না। তাঁরা ধনতন্ত্রের পরিবর্তে অধিকতর ন্যায় সঙ্গত শ্রেণীহীন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আদর্শ প্রচার করেন, কিন্তু কমিউনিষ্টদের একনায়কতন্ত্রের উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণ করেন না। পরিবর্তে তাঁরা তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের আদর্শ তুলে ধরেন। ব্রিটেনে এই আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টা চলেছে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে ধনতান্ত্রিক অর্থ নীতির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যে পার্থক্য ছিল, তা কার্যক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কারণ উভয় তত্ত্বেরই সূত্রপাত অর্থ নৈতিক মানুষের প্রত্যয় থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ধনতন্ত্রের প্রাচুর্যের যুগে

উদারনৈতিক ধনীরা সর্বপ্রথম কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি—লেবার পার্টি ধনীদের সেই কল্পনাটিকেই গ্রহণ করেছে। এই কল্পনাটির রূপদান প্রচেষ্টাকেই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বলা হচ্ছে। এটা অবশ্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, কারণ এতে মানুষ ভোট দিতে পায়। কিন্তু এই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ কতটুকু আর্থিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে? এই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র প্রত্যেক দিনমজুরকে দু'পাটি বাঁধান দাঁত বিনামূল্যে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে; অবশ্যই দাঁতটা সর্বাগ্রে দিতে হবে, কারণ সেটা সব মানুষেরই জন্মগত অধিকার, কিন্তু সেই দাঁতে চিবানোর জন্য সপ্তাহভোর মাংসের বরাদ্দটা যদি একটা দেশলাই বাক্সের চেয়ে বড় না হয়, তবে তাতে ক্ষতি নেই। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের কল্যাণব্রতের মধ্যেও কিছু কারচুপি আছে। এই কল্যাণব্রত পালনের জন্য শ্রমিকের বেতন থেকেই কিছু কেটে রাখা হয় এবং সেটাই পরে সুবিধা, সেবা ও অনুদানরূপে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই আদায় ও দান কার্যের খরচের জন্য শতকরা ২০ থেকে ২৫ অংশ কেটে রাখা হয়। এ সব কথার কথা নয়—বাস্তব সত্য। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রেও আর্থিক কল্যাণ মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। মূল্য হল ব্যক্তিস্বাধীনতার বাজেয়াপ্তি ও হুকুম মত চিন্তা করতে বাধ্য হওয়া*। অর্থনৈতিক মানুষের প্রত্যয়ের ওপর ভিত্তি করে যে মতবাদ গড়ে ওঠে, তা সে রক্ষণশীল, উদারনৈতিক বা বৈপ্লবিকই হোক তাতে ব্যক্তি স্বাধীনতার লোপ ও মনুষ্যত্বের অবনতি অনিবার্য। মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি যদি স্বার্থপর ও অযুক্তি পরায়ণ

*পার্টির হাতে সকল ক্ষমতা তুলে দেওয়া এবং পার্টি শাসিত ট্রেড্ ইউনিয়ান-গুলির হুকুম অনুসারে ব্যক্তি শ্রমিকের চলাবলা, আচার-আচরণ নির্ধারিত হওয়া। (অনুবাদক)

মাত্র হয় তা হলে এক মানুষের হাত থেকে অপর মানুষকে রক্ষা করার জন্য সমাজ দলন-পীড়নের যন্ত্র রূপেই গড়ে উঠবে। তখন সমাজ হবে একটা কয়েদখানা, কয়েদী মানুষকে পাহারা দেবার জন্যে থাকবে একদিকে তাদের পাপাতঙ্কে আতঙ্কিত করার জন্য স্বর্গীয় তখমাধারী পাদ্রী পুরোহিতের দল, আর অপর দিকে থাকবে সরকারী তখমাধারী পুলিশ। সুতরাং বর্তমান সংকট থেকে সভ্যতাকে উদ্ধার করার জন্য যে সমাজ দর্শনের প্রয়োজন তার সন্ধান অর্থ নৈতিক নির্দেশ্যবাদের মধ্যে মিলবে না।

এই সংকটের নিদান নির্দেশ করতে কেউ কেউ রাজনৈতিক তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান সমূহের গলদকেই দায়ী করেন। তাই তাঁরা পার্লামেণ্টারি শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য নানা কলা কৌশল অবলম্বনের সুপারিশ করে থাকেন। যে সব কলা কৌশলের কথা তাঁরা বলেন, সে সবের বিচার বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন নাই। যতদিন তাঁরা মানুষকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দিতে থাকবেন ততদিন তাঁদের সকল কলাকৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য।* এসব রাজনৈতিক তত্ত্বের

*এই যে, "মানুষকে গুরুত্ব" দেবার কথা, এটির তাৎপর্য অনেকের নিকট স্পষ্ট না হবার সম্ভাবনা আছে। এর অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তিমানুষ একা একা আদর্শ মানুষ হবার চেষ্টা করবে, তারপর সকল মানুষ যখন আদর্শ মানুষ হয়ে উঠবে তখন আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। এর অর্থ হল, ব্যক্তি মানুষের হাতে তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে দিলে সেই ক্ষমতার বলে নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সকল মানুষ সমবেত ভাবে তাদের সকল সমস্যা সমাধান করে করে চলবে। এর ফলে অবিলম্বে সমগ্র দেশে সকল মানুষের নিজেদের চেষ্টায় অর্থ নৈতিক সমস্যাই যে কেবল সমাধান হতে থাকবে তাই নয়, অপর সকল সমস্যাও সমাধান হতে থাকবে এবং সেই সঙ্গে দায় দায়িত্ব ঘড়ে চাপার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তির অনুশীলন ও চর্চার ফলে সকলের জ্ঞানবুদ্ধিরও দ্রুত বিকাশ লাভ ঘটতে থাকবে। (অনুবাদক)

প্রধান ভুল হল, এঁরা মানুষের চেয়ে প্রতিষ্ঠানকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, মানুষই যে প্রতিষ্ঠান সমূহ নিজের মঙ্গলের জন্যে গড়ে তোলে সেই সত্যটি ভুলেছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমাজকে পুনর্গঠন করতে হলে মানুষকে দিয়েই তা সুরু করতে হবে। মানুষ যদি কেবল স্বার্থপর জীবই হয় তা হলে সমাজে তার স্বার্থপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দমন-পীড়নকারী একটি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিতেই হয়। তখন খুব ভাল ভাল তত্ত্ব ও সংবিধানও মানুষের স্বাধীনতা আনতে বা কল্যাণ বিধান করতে সক্ষম হবে না। এটা অতিশয় স্পষ্ট যে, মানুষের কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান মানুষ নিজের হাতেই গড়ে তুলতে পারে, অন্য কারুর দ্বারা তা মাথার ওপর চাপিয়ে দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এবং সে কাজ আজ পর্যন্ত হয় নি বলে মানুষের মুক্তিও মেলেনি, তবে তাতে তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ঘোচেনি—সে আজো সমান ভাবেই মুক্তি পিয়াসী।*

* মুক্তি পিয়াসা মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি। সেই জন্য শতসহস্র বৎসর ধরে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও দাস বংশের সন্তানদের মধ্যে মুক্তি-পিয়াসা মরে না। স্বাভাবিক মুক্ত মানুষের মতই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাদেরও থাকে এবং তাদেরও জোর করে, তালিম দিয়ে, মগজ ধোলাই ক'রে, পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে দাস তৈরী করতে হয়। কিন্তু সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে মুক্ত হতে চায়।

শিক্ষা, তালিম, পরিবেশ (nurture) মানুষের স্বভাবকে (nature) অনেকখানি পরিবর্তিত করতে পারে সত্য, কিন্তু সেই পরিবর্তিত স্বভাব সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত হয় না। তালিম দিয়ে মনুষ্য সন্তানকে সাঁতার শেখান যায়, তারের ওপর হাঁটতে শেখান যায়, কিন্তু তার সন্তান তাই বলে জন্মানর সঙ্গে সঙ্গে সাঁতরাতে পারে না, তারের ওপর হাঁটতে পারে না—তাকেও শিখতে হয়। কারণ জীবের সহজাত প্রবৃত্তি প্রজাতি (spicies) পরিবর্তন না হলে বদলায় না।

এই ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে যে নতুন পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে, তার জন্য যে সামাজিক দর্শনটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার উদ্ভব ঘটেছে বর্তমান সভ্যতার সংকটের নিদান সন্ধান প্রচেষ্টার মধ্য থেকে। এই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক পৃথিবীর ইতিহাসের শিক্ষাকে ভিত্তি করে আমরা বর্তমান সংকটের নিদান নির্ণয় করতে অগ্রসর হই। আমরা আবিষ্কার করি এ যুগের সব অমঙ্গল— রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব, জনসাধারণের দারিদ্র্য, সর্বগ্রাসী মতবাদের উদ্ভব, একনায়কতন্ত্রের বিপদ, আর একটি বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ভীতি প্রভৃতি আরো সব সমস্যার একমাত্র কারণ হল: মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা। এই ভুল ধারনার নানা রকমফের আছে; তার ওপর ভিত্তি করে যে সকল সামাজিক দর্শন গড়ে

পরিবেশ ও তালিমের সাহায্যে মানুষের স্বভাব যে পরিবর্তিত করা যায়, এবং সেই পরিবর্তিত স্বভাব সন্তান-সন্ততিতেও সংক্রামিত হয়, এই বিশ্বাস সোভিয়েট রুশিয়ায় ষ্ট্যালিনী যুগে খুবই মুখরোচক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরূপে প্রচারিত হতে থাকে। এর নামকরণ হয়, মিচুরিন-লাইসেঙ্কো তত্ত্ব। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল এই যে, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের একাধিপত্যের অধীনে দু'এক পুরুষকে চেপে রাখতে পারলে সারা দেশের ভবিষ্যৎ বংশধররা একেবারে কমিউনিষ্ট হয়ে জন্মাবে, তালিমের দরকার হবে না। কিন্তু তা হল না। রুশিয়ার প্রকৃত বৈজ্ঞানিকেরা যে এ তত্ত্বের বিরোধিতা ক'রে দুঃখ বরণ করলেন তাই নয়, পঞ্চাশ বছর ধরে দুই পুরুষ নর-নারীকে কমিউনিষ্ট একাধিপত্যের ছাঁচের মধ্যে চেপে রেখেও নতুন বংশধরদের জন্মগত কমিউনিষ্ট করা গেল না। তাদেরও পূর্বের মতই তালিম ও মগজ ধোলাই দরকার হচ্ছে।

অর্থাৎ কমিউনিষ্ট শাসিত দেশে মানুষের জন্মগত স্বাভাবিক মুক্তিপিয়াসাকে দমন করে রাখতে একাধিপত্য শাসিত রাষ্ট্রের শিকল দেবীর পূজাবেদীকে চিরকালই খাড়া রাখতে হবে। (অনুবাদক)

তোলা হয়েছে, তার ফল হয়েছে, মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এই সব বিশ্লেষণের ফল দাঁড়াল এই যে, আধুনিক সভ্যতার সংকট হচ্ছে এক আত্মিক সংকট—মানুষের আপনার স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও আস্থাহীনতার ফলে উদ্ভূত সংকট।

আরো অনেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। কিন্তু তাদের বিশ্বাস, মানুষের মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ও তার নৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হল বর্তমান সমাজের মধ্যে মানুষ যে সকল দুঃখজনক ও অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা পাচ্ছে তা সেই সকল অভিজ্ঞতা জনিত। এই মতের অনুসিদ্ধান্ত এই যে, এ যুগের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হল, অধিকতর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও আরো বেশী ন্যায় সঙ্গত অর্থ নৈতিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সমাজের পুনর্গঠন।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই মতের শূন্যগর্ভতা প্রমাণ হয়ে গেছে, দেখা গেছে যে, এ রোগের এ ওষুধ নয়। যে কয়টি দেশে এখনো পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের কাঠামোটা টিকে আছে সেখানেও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, সর্বগ্রাসী মতবাদের (জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিষ্ট) অশুভ ছায়া ব্যক্তি স্বাধীনতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে ; একনায়কতন্ত্রের আবেদন ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে ; অর্থ নৈতিক সংকট সর্বত্রই বেড়ে চলেছে ; আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি করতে হচ্ছে ; রক্তাক্ত বিপ্লব স্বাধীনতা হরণ করছে ; এত করেও কিন্তু সামাজিক ন্যায়নীতি ও অর্থ নৈতিক সাম্যের আদর্শ তেমনই দূরে থেকে যাচ্ছে।

এই বিশৃঙ্খল নৈরাশ্যজনক অবস্থার অভিজ্ঞতা বর্তমান সংকটের

আরো গভীরে প্রবেশ ক'রে তার কারণ অনুসন্ধান করার গুরুত্ব আমাদের কাছে তুলে ধরেছিল। তারই ফলে আবিষ্কার করা হয়েছে, সকল সংকটের মূলে আছে মানুষের স্বরূপত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা জনিত আত্ম-বিশ্বাসের অভাব। আরো সব ভাল ভাল প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে তোলাই যদি বর্তমান যুগের প্রয়োজন হয়, তবে সে সব গড়ে তুলতে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান মানুষের ও প্রয়োজন আছে। নতুন প্রতিষ্ঠান সমূহকে যদি সক্রিয় করে টিকিয়ে রাখতে হয়, তবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এসবের প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষার জন্য এ সবকে একেবারে তলা থেকে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিষ্ঠান সমূহকে গণ-সংযোগের দ্বারা সক্রিয় করে রাখার কাজ কোন সরকার, রাজনৈতিক পার্টি বা ডিকটেটরের দ্বারা হবে না। প্রতিষ্ঠান সমূহ যখন ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন এরা সমাজের নরনারীর সচেতন সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে বিপদের সময় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এতদিন জন সাধারণকে সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত রেখে, তাদের এমনই পরমুখাপেক্ষী করে রাখা হয়েছে যে, সৃজনী ক্ষমতা যে তাদের আছে তা তারা ভুলে গেছে। সেজন্যই বর্তমানে তারা নিজেদের একান্ত অসহায় ভাবছে, হতাশায় তাদের মন ভরে গেছে। এই আবহাওয়ায় কিছুই গড়ে তোলা যায় না। কেবল এই কারণেই আধুনিক সভ্যতার বিশাল কাঠামো ধ্বংস হতে বসেছে।

এটা শোকাবহ সন্দেহ নেই। কিন্তু এর চেয়েও শোকাবহ ব্যাপার ঘটছে। মানুষ ঈশ্বরের উপরেও আস্থা হারিয়েছে। এই হতাশার মধ্যে প্রচলিত ধর্মে তারা আর সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। আমাদের এই যুগের আত্মিক সংকট থেকে জেগে উঠছে এক নতুন ধর্ম। এই স্থূল জড়বাদী ধর্মের ঈশ্বর হচ্ছেন জনতা ; রাজনৈতিক পার্টি হচ্ছে যাজক সম্প্রদায়,

আর নেতা হচ্ছেন প্রধান পুরোহিত। ব্যক্তির ওপর তাদের কোন বিশ্বাস নেই। তাঁরা বিশ্বাস করেন, যখন হাজার হাজার অসহায় মানুষ এক সঙ্গে জোট বেঁধে পার্টি ও নেতাকে অনুসরণ করতে এগিয়ে আসে, তখন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির উদ্ভব হয়। এটা কিন্তু একটা অন্ধ বিশ্বাস মাত্র; এবং এতই অন্ধ যে এ বিশ্বাসের যুক্তির মধ্যে যে ভুল আছে তাও তাদের চোখে পড়ে না। তাদের বিশ্বাস, একটা শূন্যের কোন মূল্য নাই বটে, কিন্তু যখন লক্ষ লক্ষ শূন্য পাশাপাশি রাখা যায় তখন তার যোগফল হয়ে দাঁড়ায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। এই নতুন ঈশ্বর জনতা নামে, জাতি বা শ্রেণী নামে পূজিত হন। এই ভাবে কখনো বা সম্পূর্ণ মহাদেশটাই ঈশ্বরত্ব লাভ করে, যেমন এশিয়ার উত্থান সম্বন্ধে এক মিষ্টিক বিশ্বাস।

রোগের সঠিক নিদান নির্ণয়ের ওপরই ঔষধের নির্বাচন নির্ভর করে। রোগের মূলেই আঘাত করতে হবে। মানব প্রকৃতির সঠিক ধারণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে তুলতে হবে নতুন এক সমাজ দর্শন, যা মানুষের আত্মশক্তির ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

কোন অতিমানবিক শক্তিতে বিশ্বাস করা যদি মানুষের জন্মগত স্বভাব হয়, এবং সেই বিশ্বাসে যদি নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে তোলার মত মনের জোর তার না থাকে, তা হলে মানুষের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ আমাদের অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। ধার্মিক লোকেরা খোদার সৃষ্টির ওপর খোদকারী করার কথা ভাবতেও পারে না।

অপরদিকে মানুষকে যদি শুধু স্বার্থপর জীব হিসাবে ধরে নেওয়া

হয়, তবে যুক্তিসঙ্গত ভাবে এটাও মেনে নিতে হয়, রাষ্ট্রের দমন-পীড়নের ক্ষমতা ও ধর্ম কর্তৃক পাপাতঙ্ক সৃষ্টি করা ছাড়া কোন দিনই সমাজ চলতে পারে না। সুতরাং মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে এই বিকল্প ধারণাও মুক্তির আদর্শকে বাতিল করে দেয়।

কিন্তু সভ্যতার ইতিহাস প্রমাণ করেছে, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে এই দুই মতই ভুল। সমগ্র ইতিহাসেই আমরা দেখি, প্রশ্নকারী অবিশ্বাসীরাই মানব প্রগতির অগ্রদূত। অন্ধবিশ্বাস অজ্ঞতা প্রসূত। অন্ধ বিশ্বাসটাই যদি মানব প্রকৃতি হত, তা হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের এত উন্নতি হত না এবং মানুষকে সেই আদিম যুগের পরম-শান্তিময় অজ্ঞতার মধ্যেই বাস করতে হ'ত।

মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে অপর মতটিও ভ্রান্ত। এটা সত্য যে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করাটাই মানুষের সর্বপ্রথম কাজ। কিন্তু এই সঙ্গে এটাও সত্য যে, এই স্বার্থপরতাই মানুষকে জন্তু-জানোয়ারের স্বার্থপরতার স্তর থেকে তাকে তুলে ধরেছে। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের মধ্যে এই তথ্যটা নেই যে, ব্যক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ অপেক্ষা, সহযোগিতাটাই সমাজ জীবনের ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অন্যথায় সমাজ আদিতেই ভেঙ্গে পড়ত। সুতরাং ইতিহাস থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, মানব প্রকৃতি কেবল স্বার্থপর কিংবা আত্মবিশ্বাসহীন পারলৌকিক শক্তির ওপর একান্ত নির্ভরশীল জীব নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখাও এই মতকে সমর্থন দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, এ যুগের সংকট ত্রানের পথ দেখাতে সক্ষম এমন এক নতুন দর্শন রচনা করা সম্ভব হতে পারে।

অতীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অল্পতার জন্য মানব-প্রকৃতির সম্যক ধারণা

ত মানুষের ছিলই না, পরিবর্তে তা এক অস্পষ্ট রহস্যজালে ঢাকা ছিল। বর্তমানে মানুষকে আর অজ্ঞেয় সত্তা বলার কোন হেতু নেই। মানুষ যে ঈশ্বরেরই অংশ সম্ভূত এরূপ বিশ্বাস করার পক্ষেও যুক্তি দেখা যাচ্ছে না। মানুষ যখন একটি জীব, তখন সে একটি পার্থিব সত্তা। গর্ভাধান থেকে শুরু করে একটি পূর্ণাবয়ব শিশুর জন্ম পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটাই একটা পার্থিব ব্যাপার মাত্র। এই ব্যাপারের কোন অবস্থাতেই অপার্থিব উপাদান এসে এর মধ্যে প্রবেশ করে না। দেহ যন্ত্রের যে পার্থক্যের জন্যই মানুষ ইতর প্রাণী থেকে নিজেকে পৃথক করুক, তথা কথিত আত্মাটি কিন্তু মোটেই কোন ঐশ্বরিক অংশসম্ভূত নয়। জন্ম প্রক্রিয়ার এই অতীব পার্থিব ব্যাপারের কোথাও কোন ফাঁক থাকে না, যেখানে এই ঐশ্বরিক স্ফুলিঙ্গটি প্রবেশের পথ পাবে। আত্মা নামে যেটির পরিচয়, সেটি জীবনের বিভিন্নমুখী প্রকাশেরই যোগফল এবং তা বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল মাত্র। সুতরাং যে মতে বলে, ইতর প্রাণী-জগৎ থেকে মানুষ যে নিজেকে পৃথক করতে সক্ষম হয়েছে তা এক ঐশ্বরিক শক্তি স্ফুলিঙ্গের অধিকারী হয়ে, অতএব যে অলৌকিক উৎস থেকে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করেছে সেই স্বর্গীয় উৎসের প্রতি তার বিশ্বাস অতি স্বাভাবিক এবং সেটাই তার জন্মগত প্রকৃতি—সে মতকে এই সব কারণে আমরা স্বীকার করতে পারিনা। যে স্বর্গীয় উৎপত্তির অন্ধ সংস্কারের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এতদিন মানুষ আত্মিক দাসত্বকে তার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন রূপে মেনে আসছিল, সেই সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারলেই তবে মানুষ স্বাধীন হবার কথা ভাবতে পারবে। এই আত্মিক মুক্তির ফলে এক মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য সমবেত প্রচেষ্টায় যোগ দিতে তার আত্মবিশ্বাস জাগবে। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ

করতে আমরা নৃ-বিজ্ঞান থেকেও সাহায্য পাই। এই শাস্ত্র প্রমাণ করেছে, ব্যক্তি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মনুষ্য সমাজ গড়ে ওঠে নি। আদিম মানবকে তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলতে হ'তো। অপর মানুষের সহযোগিতা পেলে তার পক্ষে এই সংগ্রাম চালানো অনেকটা সহজ হয়ে উঠত। আত্মরক্ষা ও জীবন সংগ্রামের সহজাত প্রেরণাতেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। সহজাত প্রেরণা (instinct) হ'ল যুক্তির আদিম রূপ। সুতরাং মানুষ প্রধানতঃ যুক্তিপারায়ণ জীব। জীববিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞানের দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়েছে। যুক্তিপরায়ণতা অর্থাৎ স্মৃতির সাহায্যে পূর্ব অভিজ্ঞতা সমূহের যোগাযোগ ঘটানর ক্ষমতা ইতর প্রাণীদের মধ্যেও কিছু কিছু দেখা যায়। সুতরাং যুক্তিপরায়ণতা জীবনেরই গুণ এবং সেই গুণটি সর্বোচ্চ স্তরের জীবটিতে প্রচুর পরিমাণে বিকশিত হয়ে উঠেছে।* এই যুক্তিপরায়ণতার সাহায্যেই মানুষ তার স্বার্থপরতাকে নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মার্জিত স্বার্থপরতায় রূপান্তরিত করতে পারে, এবং মার্জিত স্বার্থপরতা একটি সামাজিক গুণ রূপে সমাজে গৃহীত হয়ে এসেছে।

---

*সহজাত প্রেরণাই (instinct) যে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে মানুষের যুক্তিতে পরিণতি লাভ করেছে তার চিহ্ন যে কেবল ইতর প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যায় তা নয়, উদ্ভিদ ও এক কোষী জীবের মধ্যেও দেখা যায়। এক কোষী জীব, যে পরিবেশ তার জীবন ধারণের পক্ষে সহায়ক সে সেই পরিবেশের প্রতি ধাবিত হয়—যা সহায়ক হয় না তা পরিহার করে চলে। উদ্ভিদ আলোর প্রতি ধাবিত হয়, লতা তার আশ্রয় বৃক্ষ বা দণ্ডের দিকে আকর্ষ প্রলম্বিত করে।

(অনুবাদক)

সমাজের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব-বিরোধের যে ধারণা* এতদিন আধুনিক সমাজ চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এবার আমরা তা ত্যাগ করতে পারি। কোন কোন অর্থনীতিবিদ প্রতিযোগিতাকেই প্রগতির প্রেরণা বলে মনে করেন। বিপ্লবীরাও এই দ্বন্দ্বকে অনুরূপ মূল্যই দিয়ে থাকেন —নাম দিয়েছেন শ্রেণী বিরোধ। দ্বন্দ্ব-বিরোধ, অবশ্যই আছে এবং থাকবেও। কিন্তু সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে ইতিহাস পড়লে দেখা যায় প্রতিবেশীকে সাহায্য করার ইচ্ছা দ্বন্দ্ব-বিরোধ, প্রতিযোগিতা অপেক্ষা ঢের বেশী গভীর মানবিক মনোবৃত্তি। মানুষে মানুষে এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও অন্যান্য ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে সব ধর্ম ও সমাজদর্শন রচিত হয়েছে সে সবের চেষ্টায় ও প্রচারের ফলে মানুষ তার অন্তর্নিহিত যুক্তিশীলতাকে ভুলতে বাধ্য হয়েছে। অতীতে ধর্ম করেছে সর্বনাশ আর বর্তমানে দর্শন পরিণত হয়েছে, অযুক্তিবাদে। এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ সংঘাত-সংঘর্ষের তিক্ত অভিজ্ঞতা সহযোগিতার আশা নির্মূল করছে। এ সবের মিলিত ফল দাঁড়িয়েছে মানুষের আত্মবিশ্বাসের অভাব।

মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বর্তমান যুগের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক সংকটের মূল কারণ আমাদের স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে। তার ফলে আধুনিক জীবনের কঠিনতম সমস্যাগুলি সমাধানের সম্পূর্ণ এক নতুন পথ আমরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। এ সংকট সমাজ জীবনের দু একটি দিককে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, মানুষের সমগ্র সত্তাকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। সুতরাং যেহেতু এ

*মার্কসের কথা, "শ্রেণীবিরোধের ইতিহাসই সভ্যতার ইতিহাস" স্মর্তব্য। (অনুবাদক)

[ম]ানুষের আত্মার সংকট, সেই হেতু একে আত্মিক সংকটও বলা চলে। [ম]ানুষ তার স্বরূপ ভুলে গেছে। বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধার লাভের [এ]কমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, সে মানুষ এবং [সে] কোন অলৌকিক বা লৌকিক মুনিবের ক্রীতদাস নয়।

এই নতুন জীবন দর্শনের মূলতত্ত্বগুলি তিন বছর পূর্বে রচিত হয়। [আ]মরা এর নাম দিয়েছি নব-মানবতাবাদ বা বৈজ্ঞানিক বা অখণ্ড [ম]ানবতাবাদ। সম্পূর্ণ নতুনত্ব অবশ্য এতে নেই। মানবতাবাদ ইতিহাসের [আ]দি যুগ থেকেই আছে। সর্বযুগের মানবতাবাদেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য [ছি]ল এই বিশ্বাস যে, কতকগুলি মানবীয় মূল্যমান আছে, যার স্থান সব [বি]চার-বিবেচনার উর্ধে এবং মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ [স]াধন করাই ছিল মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ; এবং সমাজের [র]াজনৈতিক আচরণ, অর্থনৈতিক সংগঠন, শিক্ষাসংস্কৃতি প্রভৃতির লক্ষ্য [ছি]ল মানব জীবনের এই উদ্দেশ্য সাধন। কিন্তু অতীতে মানব প্রকৃতি [স]ম্বন্ধে ভুল ধারণা মানব জীবন দর্শনের এই আদর্শের বিরোধী হয়ে [দ]াড়ায়। এই সব মানবতা বিরোধী জীবনাদর্শ মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে [ত]দানীন্তন প্রচলিত ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে এদের [ক]াছে প্রাচীন মানবতাবাদ হেরে যায়। কিন্তু আজ ইতিহাস ও অন্যান্য [বি]জ্ঞানের সাহায্যে মানবতাবাদ মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে অতীতের ভুল [ধ]ারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ও নিজেকে ত্রুটিমুক্ত ও যুক্তিসহ [ক]রতে সক্ষম হয়েছে। সেই জন্য আমরা এর নাম দিয়েছি নব-[ম]ানবতাবাদ। এর যা কিছু নতুনত্ব তা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে লব্ধ বলে [এ]র প্রকৃত নাম হওয়া উচিৎ বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ। সার্বভৌম [ক্ষ]মতার তত্ত্ব এবং ব্যক্তিমানুষের সার্বাগ্রগণ্যতা আমরা নতুন করে,

ঘোষণা করেছি এবং তা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে করিনি, করেছি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

মানুষের আত্মশক্তি উদ্বোধিত ক'রে মানুষ যে নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে পারে, ব্যক্তি মানুষের মনে এই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনে বর্তমান সমস্যা সমূহ সমাধান করার এই নতুন ধরণের প্রচেষ্টার মধ্যেই আছে, অন্যান্য মতের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার কথাই ধরা যাক। সবাই জানে যে অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এর প্রতিবিধান প্রচেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে সহজ কর্ম হল, এ অবস্থার জন্য অপরকে দায়ী করে তাকে গালমন্দ করা এবং সেজন্য 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' রূপ সরকারত আছেনই। এই অবস্থার বিরুদ্ধে সব অভিযোগই শেষ পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে গালাগালিতে পর্যবসিত হয়। তারপরই দাবী জানান হয়, অভিযোগকারীদের নেতৃত্বে এক বিকল্প সরকার গঠনের। বলা হয়, এরূপ পরিবর্তনের দ্বারাই সব সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু কেমন করে তা হবে, ক্ষমতার দাবীদাররা তা ব্যাখ্যা করতে চান না। কী করে সমস্যার সমাধান হবে তা যদি প্রকৃতই তাঁদের জানা থাকে তবে সরকারকে তাঁদের জ্ঞানের সুবিধাটুকু পেতে দেন না কেন? আজ যাঁরা ক্ষমতার আসনে তাঁরা ক্ষমতাকাঙ্ক্ষীদের চেয়ে জন কল্যাণের জন্য কম চিন্তিত, একথা বিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। সরকার হয়তো ভুল করে ঠিক কাজটা করতে পারছেন না। কিন্তু যাদের নিয়ে সরকার গঠিত তাঁরা ত মানুষ, সুতরাং ভালমন্দ বিবেচনা করার শক্তি তাঁদের আছে। সুতরাং যদি তাঁদের যুক্তিবুদ্ধির কাছে আবেদন জানানো হয় এবং কি করে আরো ভালো ভাবে কাজ করা যাবে, তা বার বার বল

হয় তবে তারা হয়তো আপনার কথা না শুনে পারবেন না। কিন্তু আপনারা যদি নিজেরা ক্ষমতায় বসার উদ্দেশ্যে তাদের সরে দাঁড়াবার জন্য জেদ করতে থাকেন, তা হলে তাঁরা সমান জেদের সঙ্গেই আরো শক্ত হয়েই বসতে চাইবেন এবং ভুল নীতিটাই জেদের সঙ্গে অনুসরণ করে চলবেন। ক্ষমতাসীন মানুষরা ক্ষমতা ধরে রাখার দুর্ভাবনায় ব্যাকুল। নীতির দিক থেকে ক্ষমতাকাঙ্ক্ষীদের যদি দোষ না থাকে, তবে যাঁরা ক্ষমতা দখল করে আছেন তাঁদেরই বা দোষ থাকবে কেন? একজন মানুষের যতটুকু সৎ হবার সম্ভাবনা থাকে, আর একজনেরও ঠিক তাই থাকে। কাজেই ক্ষমতাসীন মানুষদের নীতিবোধ ও যুক্তি-শীলতার কাছে আবেদন জানানই হচ্ছে রাজনীতিকে বিশুদ্ধ করার একমাত্র উপায়। এ উপায় কোন অবাস্তব নীতিবাগীশের উপদেশামৃত বিতরণ করা মাত্র নয়। এটি হল বাস্তব রাজনীতির আচার আচরণকে পরিশুদ্ধ করার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থা। ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদেরও পরবর্তী নির্বাচনে ভোটের দরকার হবে। যে সব সমস্যা সমাধানে এই সব রাজনীতিকরা ব্যর্থ হচ্ছেন সেই সব সমস্যা সমাধানের কোন নতুন পথ যদি জানানো যায় এবং সেই সঙ্গে তার সমর্থনে এক জনমত গড়ে তোলা যায় তা হলে সে কথা শুনতে তাঁরা বাধ্য হবেন।

সমস্যা সমাধানের দুটি পথ আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে একেবারে মৌলিক। সমস্যার মূল যেখানে সেখান থেকেই তাকে উৎপাটন করতে হবে। উপর থেকে কতকগুলি সংস্কার ব্যবস্থা চাপিয়ে দিলেই সমাজ ও জীবন দোষ মুক্ত হয়ে যাবে না, সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যা যেখানে, সেই তলা থেকেই স্বুরু করতে হবে। যতদিন জনসাধারণ চাইবে যে তাদের হয়ে অপর কেউ সমস্যার সমাধান করে

দিক, ততদিন অপরের আদেশ পালনের জন্য, বিনা প্রশ্নে অন্ধভাবে অনুসরণ করার জন্য, অপরের ইচ্ছা অনুযায়ী তালে তালে পা ফেলে চলতে হবে। পরিবর্তে তারা যদি মুক্তিকামী হয়, তা হলে সর্বাগ্রে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে যে, মুক্তি অর্জন করার মত ক্ষমতা তাদের আছে। প্রথমেই যদি তারা বলতে পারে, অপরের নিকট থেকে তারা যা প্রত্যাশা করে সে কাজ মানুষ হিসাবে তারাও পারে, তবে এই যোগ্যতা প্রমাণ করার কাজ সুরু হয়ে যাবে। তাদের পক্ষে হয়ত সমগ্র ভারতের অর্থনীতি পুনর্গঠন করা সম্ভব হবে না। কিন্তু তারা পথের নির্দেশ দিতে পারে। সে পথ হচ্ছে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হিসাবে স্থানীয় সমবায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে তোলা। জন সাধারণের উদ্যোগকে সরকারের উৎসাহ না দেবার কারণ নেই। সরকারের উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকারের সততায় সন্দেহ না করে আমরা তাদের শুভবুদ্ধির কাছে ধৈর্য্যের সঙ্গে আবেদন জানাতে থাকব, আর সেই সঙ্গে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কাজ করে চলব।

অনেকে বলেন ভারতের আর্থিক প্রাচুর্য নির্ভর করছে বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার সামর্থ্যের ওপর। সেই সঙ্গে তাঁরা এ কথাও বলেন, ভারতের নিজস্ব সংগতির ওপর নির্ভর করে বৃহৎ ও ভারী শিল্প গড়ে তোলা যাবে না। সে জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু ডলার তা ইচ্ছামত আসেনা। এই অবস্থায় আমরা কী করতে পারি? বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া কী আমাদের চলবে? হাঁ চলবে। কী করে তা চলবে তা নির্দেশ করাই হচ্ছে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নতুন পথ সংক্রান্ত বিবৃতিটির উদ্দেশ্য।

মানুষ যে প্রধানতঃ যুক্তিপরায়ণ জীব, বিজ্ঞান সম্মত এই বিশ্বাসে

আমরা সরকারের কাছে এটি পেশ করছি এই আশায় যে তাঁরা হয়তো তাঁদের নীতি পরিবর্তন করে এটি গ্রহণ করতে পারেন। সেই সঙ্গে আমরা এ কথাও বলছি, সরকার কিছু করুক আর না করুক, জনগণ যেন এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনাটিকে রূপায়িত করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

ভারতে গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার সমস্যা সমাধানের মানবতন্ত্রী পথ অনুরূপ ভাবেই যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব। এতেও তলা থেকে উদ্যোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে ওঠেনি। ভারতের মত যে সব দেশে ভোটাররা রাজনীতি জ্ঞানে অশিক্ষিত, সে সব দেশে এই আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র ত আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ রূপেই প্রতিভাত হয়। পার্টিতন্ত্র মানুষের রাজনৈতিক মুক্তি আনবে না। কারণ পার্টিরা নিজ হাতে ক্ষমতা রাখার জন্য বক্তৃতার জোরে সাধারণ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করতে না শিখিয়ে পার্টি নির্ভরশীল করে তোলে। বর্তমান সরকারের কার্যকলাপে যারা অসন্তুষ্ট, তারা ক্ষমতা দখলের জন্য বিরোধী দল গঠনের কথা বলে থাকেন। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রে একমাত্র ভোটের সাহায্যেই ক্ষমতা দখল করা যায়। নির্বাচনে জয়লাভ করতে হলে বর্তমান সরকার যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, বিরোধী দলকে তাই করবার জন্য অঙ্গীকার করতে হবে। সেই অঘটন তাঁরা কি করে ঘটাবেন তা তাঁরা বলেন না। বর্তমান সরকার যাঁদের নিয়ে গঠিত তাঁরা সব দেবদূত বা অতিমানব নন, এবং বিকল্প সরকার যাঁরা গড়বেন তাঁরাও তাঁদেরই মতন তা হবেন না। কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা আছে। তার ফলে একদল যেমন ব্যর্থ হচ্ছেন অন্য দলও তেমনি ব্যর্থ হ'তে পারেন।

কিন্তু পার্টি রাজনীতিতে ঐরূপ সৎ স্বীকারোক্তির স্থান নেই। প্রত্যেক পার্টিকেই অঘটন ঘটাবার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এবং পার্টি সমূহের এই সব কথায় বিশ্বাস করার অর্থ ভোটারদের যুক্তিহীন বিশ্বাস প্রবণতা। সুতরাং নির্বাচনী প্রচারে অন্ধবিশ্বাসী অজ্ঞ মানুষের ভাবাবেগের নিকটই আবেদন জানাতে হয়। একমাত্র পাক্কা বাক্‌সর্বস্ব ভাঁওতাবাজ লোকেরাই এতে সাফল্য লাভ করতে পারে। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের এই মাপকাঠি ; এই মাপকাঠি দিয়ে মাপলে—অর্থাৎ মাথা গুণতি দিয়ে অনুগামীর সংখ্যা বিচার করলে হিটলারের মত পাক্কা ডিকটেটরকেই আমাদের যুগের সবচেয়ে সফল গণতন্ত্রী বলতে হয়। কারণ বক্তৃতার জোরে জনগণের অন্ধ আবেগকে জাগিয়ে তুলে হিটলার কয়েকবারই তাদের প্রায় সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করেছিল। মানুষ যখন ন্যায়-নীতি যুক্তি বোধ হারিয়ে ফেলে, তখন সেই সব ব্যক্তি-মানুষের সমষ্টির কণ্ঠে আর দৈব-বাণী উচ্চারিত হয় না (Vox populi vox dei) বক্তৃতার জোরে মানুষদের ভুলিয়ে নির্বাচনে জেতবার এই পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মানুষকে (ঠিক টিকিট দেবার বা ওজন করার যন্ত্রের মত) এক একটি ভোট দেবার যন্ত্রে পরিণত করেছে। ভারতীয় জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস প্রবণতা এবং অতি প্রাকৃত ঘটনা মিরাক্‌ল-এ বিশ্বাস প্রবণতা থাকার ফলে এখানে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের এই অধঃপতন যে ঘটবেই তা জানা কথা।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ সব কথা জেনে শুনেও যে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের এই বিপজ্জনক পথ আঁকড়ে আছেন, তার কারণ তাঁরা মনে করেন যে, এর একমাত্র বিকল্প কমিউনিজম—যা তাঁরা চান না অন্যদিকে পৃথিবীর বহু দেশে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের নৈরাশ্যজনক

অভিজ্ঞতার ফলে অল্পবুদ্ধি আদর্শবাদীরা কমিউনিজমের সঙ্গেই চলার চেষ্টা করছেন। বলা হচ্ছে, রুশ কমিউনিজম মন্দ বটে, কিন্তু চীনা কমিউনিজম গণতান্ত্রিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে। সেখানে নাকি জনগণের সমর্থনেই কমিউনিজম জয়ী হয়েছে। জাতীয়তাবাদের দ্বারা কমিউনিজম শুদ্ধ হয়ে উঠেছে—এই ধারণাটাই ভুল। চীনেতেও কমিউনিজমের অর্থ হিংসা, সর্বপ্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতার লোপ সাধন প্রভৃতি কমিউনিজমের সেই চিরাচরিত আচার-আচরণ। কমিউনিজম রুশ মার্কাই হোক, বা চীন মার্কাই হোক তার সঙ্গে আসবে দীর্ঘকাল ব্যাপী দমন-পীড়ন, হিংসার দ্বারা সৃষ্ট রক্তাক্ত বিভীষিকা, হুকুম অনুসারে তালে তালে চলা-বলা, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিলোপ এবং সম্ভবতঃ গৃহযুদ্ধ এবং অরাজকতা। রক্ত ও অশ্রুসাগরের পরপারেই সকল-পাওয়ার সোনার-দেশ আছে ভেবে এই মহাসর্বনাশকে স্বাগত জানান নিছক বাতুলতা।

তবে কী কোন তৃতীয় পথ নেই? মানসিক জড়তায় আড়ষ্ট হয়ে দুটি মন্দের মধ্যে কম মন্দটি বেছে নেওয়া ছাড়া কী আর কিছুই করার নেই? এ দুয়ের মধ্যে একটিকে বাছাই করার কাজও কী সম্ভব হবে? দেখা দেবে তখন অশেষ বিশৃঙ্খলা, কারণ বেছে নেওয়াটাও হচ্ছে মত ও ঝোঁকের ব্যাপার। অতএব তৃতীয় পথের সন্ধান করতে হবে। কমিউনিজমকে বাতিল করলেও আকার সর্বস্ব পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের দোষত্রুটিগুলিকে মেনে নেওয়া যায় না। পার্লামেণ্টের সাহায্যে এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এর জন্য যে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রয়োজন তা আমাদের দেশে নেই। এরূপ অবস্থায় পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র যে শুধু বাক্‌সর্বস্বতা আর ধোঁকাবাজিতে পরিণত হতে পারে তাই

নয়, তাতে করে গণসমর্থনে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে। অপর পক্ষে আমরা নতুন স্বাধীনতা লাভ করেছি, আমাদের নতুন সংবিধান রচনা করতে হচ্ছে, সুতরাং আমরা পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি ও আকার সর্বস্বতার সংশোধন করেই চলতে পারি। গণতন্ত্রকে মানবিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে আমরা একবার দেখতে চাই তা বর্তমান সংকট থেকে মানব সমাজকে মুক্ত করতে পারে কিনা। আগামী নির্বাচন এ কাজ সুরু করার পক্ষে একটা সুযোগ হতে পারে। আমরা জনসাধারণকে কোন পার্টির কথায় আস্থা স্থাপন না করে তাদের নির্বাচন কালীন প্রতিশ্রুতিগুলি যাচাই করে নেবার উপদেশ দেব। সর্ব প্রতিশ্রুতিই হয়ত আন্তরিক প্রত্যয়ের সঙ্গেই দেওয়া হবে, কিন্তু সেগুলো যদি অবাস্তব হয়, তবে তার দ্বারা লোক প্রতারিত হবে মাত্র। গণতন্ত্র যাতে ভাঁওতা-বাজিতে পর্যবসিত না হয় সে জন্য মানুষের বিচার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে হবে। যে সমাজ দর্শন মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তিশীলতায় আস্থাবান, একমাত্র সেই সমাজ-দর্শনই পারে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন নির্বাচক মণ্ডলীর—যারা ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে ভেসে যাবে না—সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে এক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

মানবতাবাদের ভিত্তির ওপর গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় নীতির ওপর ভিত্তি করে আর্থিক জীবনকেও গড়ে তোলা দরকার। এই প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠবে স্থানীয় সাধারণতন্ত্র সমূহ; প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগুলি পরিচালিত হবে বলে এই গণতন্ত্র হবে বাস্তব, এবং স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে জনসাধারণের নির্ভুল উদ্যোগে ও সমবেত প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে। জনগণের নামে ক্ষমতা দখল করে

রাজত্ব করার চেয়ে জনগণের মুক্তি ও কল্যাণ কামনা যিনি করেন তিনিই এ কাজ সুরু করতে পারেন এবং এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত সরকার কতটুকু কী করবে, কী করবে না সে দিকে লক্ষ্য দেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। কিন্তু যাঁরা এ কাজে এগিয়ে আসবেন, তাঁদের আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন এবং সে বিশ্বাস জোগাবে এই মানবতাবাদী জীবন দর্শন।

জনসাধারণের বিবেচনার জন্য যে দুটি বিবৃতি প্রচার করা হচ্ছে তাতেই আমাদের কি কর্তব্য এবং কি ভাবেই বা তা করতে হবে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ বিবৃতি দুটিকে আমরা শেষ কথা বলে দাবী করি না। এতে ভবিষ্যত সমাজের জন্য কোন পাকা নক্সাও এঁকে দেওয়া হয় নি। যে সব সমস্যার সমাধানে রাজনীতিকরা এ যাবৎ ব্যর্থ হচ্ছেন তা সমাধানের জন্য এতে শুধু একটা নতুন পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে মাত্র। এই বিবৃতি দুটির সঙ্গে মতৈক্য হলেই যে তাঁদের আমাদের দলে যোগ দিতে হবে বা দলের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমাদের আবেদন হচ্ছে মানুষের যুক্তি ও নৈতিক দায়িত্ব বোধের কাছে। এই স্বার্থলেশহীন আবেদনে যে সাড়া জাগবে, তা যে শুধু আমাদের দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে তাই নয়, সভ্যতার ভবিষ্যতের পক্ষেও আশা জাগাবে।